

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া শাহরিন

রোলঃ 23100120809

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া শাহরিন

রোলঃ 23100120809

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ তাকওয়া ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া শাহরিন, আইডিঃ 23100120809 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তাকওয়া ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া শাহরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া শাহরিন

আইডিঃ 23100120809

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়- ০১ : তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি).....	5
অধ্যায়- ০২ : কুরআন- সুন্নাহভিত্তিক তাকওয়া	7
অধ্যায়- ০৩ : উত্তম আখলাক গঠনে তাকওয়া	11
অধ্যায়- ০৪ : সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু - তাকওয়া	15
অধ্যায়- ০৫ : তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত.....	18
অধ্যায়- ০৬ : তাকওয়ার উপকারীতা	29
অধ্যায়- ০৭ : সকল নবীই তাকওয়া অবলম্বনের দাওয়াত দিয়েছেন.....	35
অধ্যায়- ০৮ : তাকওয়ার পুরস্কার.....	39
অধ্যায়- ০৯ : তাকওয়া অর্জনের উপায়.....	44
অধ্যায়- ১১ : মানবজীবনে তাকওয়া	67
অধ্যায়- ১২ : আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা	76
অধ্যায়- ১৩ : পরিশেষ	79

অধ্যায়- ০১ : তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)

তাকওয়া হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল। ঈমানী জীবনের প্রকৃত রূপ ও এর সৌন্দর্য পরিস্ফুটন হয় তাকওয়ার মাধ্যমে। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার জীবন হয় তত সুন্দর ও ঈমানী নূরে আলোকিত। মু'মিনদের পরিচয় ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বারবার তাকওয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

ঈমানদারের সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রক হলো এই তাকওয়া। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একজন ঈমানদারের দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হয় এই তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে। কেবল কর্মসূচী প্রণয়নই নয়, এর সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতিও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

তাকওয়া শব্দটির সরল অর্থ আল্লাহ ভীতি। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা বা বাঁচার প্রচেষ্টা করা। তাকওয়া অর্থ সংযত, ওহির আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, অশ্লে তুষ্ট থাকা, এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে- সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপ থেকে বিরত থাকাটাই মূলত "তাকওয়া"। আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে ঢুকলেই মানুষ হয় সত্য গ্রহণকারী। আর যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তিনি হইলেন মুত্তাকী। তাকওয়ার বিপরীত শক্তি হচ্ছে 'ফুজুর'। আর 'ফুজুর' (Fujur) শব্দের অর্থ হলো আল্লাহদ্রোহী। যে আল্লাহর বিধান নিজেও মানে না অন্যকেও মানতে দেয় না আসলে সেই ফুজুরের মধ্যে ডুবে রয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন:

فَاللَّهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"অতঃপর তাকে [মানুষকে] তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"
(সূরা আশ-শামস- ৮)

নিজের ও পরিবারের জন্য মুমিনের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগটি হলো তাকওয়া। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এটি সর্বোত্তম পাথেয়। এরই দিকে আহ্বান করে কুরআন বলে,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

"আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা।" [সূরা আল-বাকারাহ- ১৯৭]

তাকওয়া এক অব্যাহত সম্পদ, অমূল্য গুণ, সম্মানিত বস্তু, মহাসাফল্য এবং উভয় জগতের কল্যাণের আধার। এর সাথে জড়িত অনবদ্য ফজিলত এবং অগণিত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটু ভাবুন। আপনি কখন কিভাবে নিজের জীবন কাটাচ্ছেন, কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে কতটুকু ভয় করতেন? আপনি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভয় করছেন কিনা? শুধু মুখেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন নাকি কাজে, কথায়, আমলে, ইবাদতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তার দিকে দৃষ্টি দেয়াই হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তাআলার এই বাণীই হয়তো পুরো বিষয়টির সারমর্ম হিসেবে যথেষ্ট:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

"আর আল্লাহ তাকওয়াবান ব্যক্তিদের বন্ধু।" (সূরা আল-জাসিয়া- ১৯)

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

"তাকওয়াবানদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।" (সূরা তাওবা- ৪)

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "অবশ্যই আমি তোমাকে মহান আল্লাহর তাকওয়া স্মরণে রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি কারণ যেকেউ আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন; যে কেউ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তিনি তার তাকওয়া বৃদ্ধি করেন।"

তাফসীর ইবনে কাসীর-এর এক ব্যাখ্যা অনুসারে অপছন্দনীয় বস্তু বা ব্যবহার পরিত্যাগ করা বা পরিহার করার নামই তাকওয়া। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু একবার [বিখ্যাত সাহাবী] উবাই ইবনে কাআব-কে তাকওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উবাই বলেছিলেন: "আপনি কি কখনো কাঁটায় ভরা রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন?" উমর বললেন: "হ্যাঁ, হেঁটেছি বৈকি!" উবাই তখন জানতে চাইলেন: "কী করে আপনি সেই রাস্তাটা

অতিক্রম করেছিলেন?” উমর বললেনঃ “আমি আমার জামার হাত গুটিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পরিশ্রম করে রাস্তাটা পার হয়েছিলাম।” তখন উবাই বললেন: “ঐ হচ্ছে তাকওয়া। সকল গুনাহের কাজ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে চলা এবং অক্ষত (বেগুনাহ/ নিষ্পাপ) অবস্থায় যাত্রা শেষ করতে পারাটাই হচ্ছে তাকওয়া।”

সূরা বাকারা এর ৫ নং আয়াতে [যেখানে আল্লাহর নির্দেশিত পথের উল্লেখ রয়েছে] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন: “মুত্তাকী হচ্ছে তারাই যারা শিরক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে এবং আল্লাহর আদেশ মেনে চলে।” তিনি আরো বলেছেন: “মুত্তাকী তারাই যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পায়, যারা জেনে শুনে সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাস রেখে।”

তাইলে আমরা তাকওয়া বলতে বুঝলাম সর্বদা আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, উনার আনুগত্য করা, ইবাদত করা সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

তাই মনে মনে বলতে ইচ্ছা হয়:-

ভালোভাবে চলতে গেলে

তাকওয়া মানতে হয়

জান্নাতের অমিয় সুখ পেতে হলে

তাকওয়া অবলম্বন-ই শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

অধ্যায়- ০২ : কুরআন- সুন্নাহভিত্তিক তাকওয়া

তাকওয়া কি শুধুই ৪ টি শব্দে সীমাবদ্ধ? কখনোই নাহ, তাকওয়া এর বিশাল গভীর তাৎপর্য আছে, আসুন এ বেপারে কুরআন কি বলে জেনে আসি:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক।
এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান- ১০২)

এখানে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না, তাকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতজ্ঞ হতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ কর। অর্থাৎ সারা জীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও তার উপরেই হয়। ঐ মহান প্রভুর অভ্যাস এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপরে তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামতের দিন তাকে উত্থিত করবেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

আমাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী , কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী। আমরা দুনিয়ায় এসেছি, বসবাস করছি, আবার দুনিয়া থেকে চলে যাব। কিন্তু আল্লাহ কি এমনি এমনি আমাদের এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন? আল্লাহ আমাদের তাঁর ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু ইবাদতের পাশাপাশি আমাদের কি কোনো উদ্দেশ্য নেই? জি আছে, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই। তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। জান্নাত যে পাবে সেই-ই সফল। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কি কোনো পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যাবে? কখনোই নاه, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত পেতে হইলে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, আল্লাহর বিধি নিষেধ মানতে হবে, আমাদের জীবনের এই উদ্দেশ্য লাভের ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর- সে ব্যক্তি উত্তম? নাকি ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে তার ঘরের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে এমন একটি গর্তের কিনারায়, যার তলায় মাটি নেই। ফলে এটা তাকে সহ (অচিরেই) জাহান্নামের (অতল) আগুনের খাদে গিয়ে পড়বে। আর আল্লাহ কখনো যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। (সূরা তাওবা- ১০৯)

এই আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে নদীর এমন কিনারাকে যাকে 'জুরুফ' বলা হয়, স্রোতের টানে যার তলা থেকে মাটি সরে গেছে এবং উপরের অংশ কোন নির্ভরতা ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। যারা আল্লাহকে ভয় না করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পরোয়া না করার উপর নিজেদের কার্যক্রমের ভিত্তি গড়ে তুলে, তাদের জীবন গঠনকে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা অস্থিতিশীল সাগর কিনারে নির্মাণ করা হয়েছে। এ উপমাটির সাথে দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক স্তরটিরও হুবহু মিল রয়েছে। এ স্তরটির উপরই আমরা সবাই আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের ইমারত নির্মাণ করি। অথচ এর কোন স্থায়িত্ব নেই। বরং আল্লাহর ভয়, তাঁর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার শক্ত পাথরখণ্ড যে কাজের ইমারতের নিচে বসানো থাকে, কেবল সে কাজটিই মজবুত ও স্থিতিশীল হয়। যে অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী মানুষ আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পরোয়া না করে নিছক দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক অবস্থার উপর ভরসা করে দুনিয়ায় কাজ করে যায়, সে আসলে নিজের জীবন গঠনের বুনিয়াদ গোড়া থেকেই ভিত্তিহীন করে দেয়। ভিত্তিহীন যে উপরিস্তরের উপর সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় জমা করেছে, একদিন হঠাৎ তা ধ্বংসে পড়বে এবং তাকে তার জীবনের সমস্ত সম্পদসহ ধ্বংস করে দেবে। (তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন)

হাদীছে তাকওয়া অর্জনের প্রতি অশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাকওয়াকে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত হওয়ার কারণ বলা হয়েছে। তেমনি তাকওয়া ব্যতীত আমল কবুল হয় না এবং এটাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসম্পর্কে কতিপয় হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো।-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... "التَّقْوَى هَا هُنَا". وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "...তাকওয়া এখানে"- তিনি বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার এ কথা বলেন। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৪)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

অর্থ: মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। পাপকাজ হয়ে গেলে তার সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করে ফেলো, যা তা মুছে দেবে। এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করো।" (তিরমিজি, হাদিস নং ১৯৮৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى - اللَّهُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান'।(তিরমিযী, মিশকাত হাদিস/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

হাসান বাছারী সামুরা ইবনু জুনদুব (রা:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'বংশগৌরব বা আভিজাত্য হলো ধন-সম্পদ। আর সম্মান-ইয্যত হলো তাকওয়া অবলম্বন করা'।(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হাদিস/৪৬৪৮)

হাসান বাসরি এ বলেন, “তাকওয়াবান ব্যক্তির আশ্রয় আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলে। এমনকি সন্দেহজনক অনেক হালাল বস্তুও তারা পরিত্যাগ করে।”[তাফসীর ইবনি কাসীর, ১/৭৪। সূরা বাকারা ২:২ এর ব্যাখ্যায়]

সুফইয়ান সাওরি-এর ভাষায়, “তাদেরকে আলাদা করে ‘(আল্লাহ) ভীরু’ ডাকার কারণ হলো, সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে কেউ ভয় করে না, তারা সেগুলোর ব্যাপারেও ভীত থাকে।”[আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/২৮৪]

উমার ইবনু আব্দুল আযীয বিষয়টি বলেছেন এভাবে, “দিনে সিয়াম পালন করা আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়াকেই তাকওয়া বলে না। বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর আদেশ মান্য করা। যাকে এর চেয়েও উঁচু পর্যায়ের (আনুগত্যের) সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে কল্যাণের ওপর কল্যাণ লাভ করেছে।”[বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ৯৬৪]

অধ্যায়- ০৩ : উত্তম আখলাক গঠনে তাকওয়া

আখলাক বা চরিত্র একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ জীবনে কারো টাকা নষ্ট হলে তার কিছুই শেষ হয় না, কারো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হলে তার কিছুটা ক্ষতি হয়, কিন্তু যার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় তার সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। আমাদের চারপাশে যারা অনেক ধন-সম্পদের মালিক বা যার অনেক ক্ষমতা আছে তাদেরকে আমরা সম্মান করি বা সম্মানিত ভাবি। হোক তারা অহংকারী, সুদ-ঘুষ লেনদেনকারী, মিথ্যাবাদী বা অত্যাচারী। তবুও তারাই যেনো সমাজের চোখে সম্মানের শীর্ষ চূড়ায়। অথচ আল্লাহর কাছে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে উত্তম আখলাক এর অধিকারী এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। আর যার চরিত্র যত সুন্দর আল্লাহ তাকে তত ভালোবাসেন এবং তার বাহ্যিক অবয়বও নূরানী করে দেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, ফেরেশ্তারাও তাকে ভালোবাসেন এবং দুনিয়ার মানুষরাও তাকে ভালোবাসেন। যার আখলাক যত সুন্দর সে তত সম্মান মর্যাদায় অধিকারী। আখলাক সুন্দর না হইলে তাকে কেউ ভালোবাসবে না, সমাজের কেউ তাকে ভালো চোখে দেখবে না, সম্মান করবে না। তবে আখলাক সুন্দর হইলে তাকে সবাই সম্মান করবে। তাই চরিত্র গঠনে বা আখলাক সুন্দর করতে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করা জরুরি। আর আখলাক গঠনে তাকওয়া হলো মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। মোদ্দা কথা, উত্তম আখলাকের অধিকারী হইতে হবে। তবে কীভাবে বুঝবেন আপনার আখলাক কেমন?? আপনার আখলাক কেমন তা বুঝা যাবে আপনি একা থাকা

অবস্থায় কেমন আচরণ করেন তার উপর? একা থাকা অবস্থায় আপনি অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন নাকি সাবধানতা অবলম্বন করছেন এইটাই মূল বিষয়। আর যে একা থাকা অবস্থায় শুধু আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত রাখে, কোনো অশ্লীলতার ধারের কাছেও যায় না সেই ই প্রকৃত উত্তম আখলাক এর অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত এবং যারা বেশি আল্লাহভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

আল্লাহ নিজে উনার কিতাবে সম্মানিত ব্যক্তিদের কথা বলে দিয়েছেন। এরপরেও আমরা কিভাবে গাফেল থাকতে পারি? কিভাবে তাকওয়া ছাড়া চলতে পারি? আমরা কি আল্লাহর কাছে সম্মানিত হইতে চাই না? আমরা কি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই না?

আল্লাহর প্রিয় হাবিব রাসূল (সা:) ছিলেন সম্মানিত। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়া যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা:)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন লোক সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, 'যে লোক আল্লাহকে বেশী ভয় করে বা তাকওয়াশীল, সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত'। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদিস/৪৬৭৬)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করে এরূপ লোক ছাড়া দুনিয়ার কোন জিনিস এবং কোন লোক রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে কখনো মুগ্ধ করতো না।” (এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে)

উত্তম আখলাক গঠন করতে যেমন তাকওয়া দরকার তেমনি দরকার আল্লাহর দাস হয়ে যাওয়া। দাস বলতে বুঝানো হয় যার নিজের কোনো স্বাধীনতা নাই, পছন্দ করার অধিকার নাই। যে সর্বত্র তার মালিক এর হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। তার মালিক যা আদেশ করে তাই করে আর যা নিষেধ করে তা থেকে দূরে থাকে। দাসের শরীরে শুধু জীবন থাকে, তাছাড়া তার সকল বিষয় তদারকি করে তার মালিক। ঠিক সেরকমি আমরা হইলাম আল্লাহর দাস। আল্লাহ যা বলবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, তার সিদ্ধান্তের বাহিরে কোনো কাজ না করা, মালিক যা বলবে তার উপর কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ না করা। মালিকের হুকুম যথাযথ মেনে চলা। যখন আমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাবো তখন আমাদের আখলাক আপনা আপনি সুন্দর হয়ে যাবে। আর দাস সব সময় তার মালিকে ভয় করে চলে। তবে আল্লাহর কর্মচারী হওয়া যাবে না। কেনো এই কথা বললাম তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি- দেখুন, আমরা অনেকেই আছি যারা শুধু নামাজ, রোজা, আরো কিছু হুকুম আহকাম এর মাঝে নিজেদের ইবাদাতকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। অন্য কোনো হুকুম যা আল্লাহ করতে বলেছেন সেগুলো মন চাইলে করি নয়তো করি না। নিজ স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করি ইসলামকে। তো এগুলো হচ্ছে কর্মচারীর কাজের মতো।

তবে দাস আর কর্মচারীর মাঝে সাধারণ কিছু পার্থক্য আছে:

১. কর্মচারীর একটা নির্দিষ্ট কর্ম ঘন্টা থাকে, হতে পারে ৭-৮ ঘন্টা, অথবা সকাল ৯টা-বিকাল ৪টা। কিন্তু দাসের কোনো কর্ম ঘন্টা নেই, সে ২৪ ঘন্টাই তার মালিকের সেবায় নিয়োজিত

২. কর্মচারী নির্দিষ্ট একটা কর্ম ঘন্টা পর সে সম্পূর্ণ একজন স্বাধীন ব্যক্তি। সে যতক্ষণ কাজ করবে ঠিক ততক্ষণই তার বস বা মালিকের হুকুম মানবে। অন্য সময় সে নিজের মতো চলবে। তার মালিকের কথায় নয়। কিন্তু দাসের কোনো কর্ম ঘন্টা না থাকায় সে পরাধীন। সে সব সময় তার মালিকের কথা শুনতে বাধ্য।

৩. কর্মচারীদের সাপ্তাহিক একটা ছুটির দিন থাকে। কিন্তু দাসের কোনো ছুটির দিন নেই

এই হচ্ছে সাধারণ কিছু পার্থক্য। তবে আমাদের বাসার কাজের বুয়ারা আগের যুগের মতো আমাদের দাস বা গোলাম না। কারণ তারা পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে আমাদের বাসা বাড়িতে কাজ করে থাকে। নির্দিষ্ট সময় কাজ করে চলে যায়। তারা স্বাধীন ব্যক্তি। তারা আমাদের কর্মচারী। আর দাস তারাই যাদের একদম ক্রয় করে নিজের কাছে গোলাম বানিয়ে রাখা হয়। যাদের আসল ঠিকানা ক্রয় করা মালিকটাই। আর দাস তখন ই হওয়া যায় যখন যে বুঝে তার মালিক কি চায়। নিজে ইচ্ছা মতো চললে সে স্বাধীন দাস নয়।

তো আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন এইটা দেখতে হবে আগে। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে , আল্লাহ আমাদের মালিক আর আমরা উনার দাস। সুরা ফাতিহাতে বলি- আমরা আপনারই (আল্লাহ) দাসত্ব করি আর আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান (সুরা-ফাতিহা:৫-৬)

এই ২ আয়াতে আমরা আল্লাহর দাস আর উনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি। আর দাস হয়ে উনার কাছেই সরল সঠিক পথ চাচ্ছি। একজন দাসের এইটাই দায়িত্ব যে তার মালিক যা বলবে তাই করা। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য আর সঠিক পথ চাচ্ছি মানে উনি যা বলবেন সেইটা করতে আমরা বাধ্য। আর যদি না শুনি তাইলে আমরা হয়ে যাবো তার কর্মচারী। আর আল্লাহ দাস যে সে সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলে। ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চায়। কিন্তু আল্লাহর কর্মচারী হলে নির্দিষ্ট সময় পরে নিজ ইচ্ছা মতো চলে। আল্লাহর হুকুম পালন করা না করাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কারণ আল্লাহর ভয় তার মাঝে তেমন থাকে না।

এখন প্রশ্ন আপনি কি আল্লাহর দাস নাকি কর্মচারী? শুধু কর্মচারীর মতো (সামান্য ইবাদত করে) কর্মঘণ্টা পালন করেন নাকি ২৪ ঘণ্টাই আল্লাহর হুকুম মতো চলার চেষ্টা করেন..?? ভুল বা গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা ইস্তেগফার করেন নাকি শয়তানের ধোকায় পড়ে হেলায় ফেলায় ছেড়ে দেন?? আর যদি দাস হয়ে থাকেন তবে কি আপনি আল্লাহকে যথাযথ ভয় করেন? তাঁর হুকুম মতো চলেন নাকি তাঁর হুকুমের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন বা অভিযোগ করেন?

নামাযে তাড়াহুড়া করা, মন চাইলে নামাজ পরলাম নয়তো পরলাম না, পর্দা না করা, মন চাইলেই হারামে যুক্ত হোন আবার মন চাইলেই বিরত থাকেন, নফসের প্রাধান্য বেশি নাকি রবের হুকুমের??

এসব প্রশ্ন করে নিজের উত্তর নিজেকে দিন, তবেই বুঝে আসবে আপনার আখলাক কেমন? আরো কতো টুকু উন্নতি দরকার নিজেরই বুঝে আসবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত পক্ষে তার দাস হবার তৌফিক দান করুক। আমিন।

অধ্যায়- ০৪ : সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু - তাকওয়া

আমরা সারাদিন কত কাজ করি- ইবাদত করা, ঘুমানো, খাওয়া, অফিসে যাওয়া/রান্না করা, খেলাধুলা করা, ঘুরে বেড়ানো, পারিবারিক কাজ, সামাজিক কাজ, অর্থনৈতিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ ইত্যাদি। কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা ছাড়াই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন পার করছি, অথচ আমাদের জীবন পরিচালনা করার একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী চললে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হবো ইন-শা আল্লাহ। তো কি সেই লক্ষ্য? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহীন জীবন মাঝি বিহীন নৌকার মতো। আমাদের প্রতিটি কাজ, কথা হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। প্রতিটি কথা-কাজ করতে হবে নিয়ত করে এবং তাকওয়ার সাথে। কি কাজ করছি? কেন করছি? কিভাবে করছি? অথবা কি কথা বলছি? কেন বলছি আর কীভাবেই বা বলছি? আমার কথায় বা কাজে কেউ কষ্ট পাচ্ছে না তো? এই ধরনের প্রশ্ন নিজেকে করে নিজের আমল আখলাক ঠিক করা যাবে একমাত্র তাকওয়া অবলম্বন করেই।

অর্থাৎ আমাদের পুরা জীবনটাই হবে তাকওয়া কেন্দ্রীক। আমাদের নিজেদের জীবনের খুটিনাটি বিষয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ ভীতি ছাড়া আমাদের কোনো কিছুই কল্পনা করা যাবে না।

আল্লাহ মানুষ এবং জীন জাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুই তার ইবাদতের জন্য।(সুরা যারিয়াত-৫৬)

আমরা ইবাদত করি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সলাত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু সেই সলাতে যদি খুশু খুজু আর একাগ্রতা না থাকে তবে তা মূল্যহীন। সলাত আদায় করতে হয় ইহসান এর সাথে। ইহসান হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করা যেনো আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি তা না পারেন, তবে অন্তত এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। ইহসান অনেকটাই তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তাকওয়া না থাকলে ইহসান অনুযায়ী ইবাদত করা যায় না। যে যত বেশি তাকওয়া সম্পূর্ণ মানুষ তার ইহসান অনুযায়ী আমল তত সুন্দর।

এবার আসি আরেকটা উত্তম ইবাদতের বিষয় নিয়ে। যা এখনকার সমাজে প্রায় শুধুই লোক দেখানো কাজ। তা হচ্ছে কুরবানী। কুরবানী ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ত্যাগের এক অনন্য নিদর্শন। এটি কেবল পশু জবেহ করা নয় বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের অহংবোধকে বিসর্জন দেওয়া এবং একটা সুন্দর, সহানুভূতিশীল সমাজ গড়া। কিন্তু এখনকার সমাজে লোক দেখানো কুরবানী যেনো মহামারি আকার ধারণ করেছে। কে কত টাকা দিয়ে কিনল? কার টা বড় আর বেশি দামী? কুরবানির পশু কিনে হার জিতের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামে সবাই। কিন্তু কুরবানী করা মানে তাকওয়ার পরিচয় দেয়া। কুরবানির মূল উদ্দেশ্য পশুর মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছানো নয়, বরং কুরবানিদাতার হৃদয়ের তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

আল্লাহর নিকট তার গোশত এবং রক্ত কিছুই পৌঁছে না, বরং তোমাদের তাকওয়াটাই তাঁর নিকট পৌঁছে। (সূরা হজ্জ-৩৭)

দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কতই না প্রচেষ্টা। দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাত চিরস্থায়ী। এইটা জানার পরেও মানুষের দুনিয়া নিয়ে প্রচেষ্টার কমতি নেই, সব কিছু এই দুনিয়াকে ঘিরেই। বড় বড় বাড়ি, গাড়ি, এতো এতো ডিগ্রি সব কিছু এই দুনিয়াকে পাবার জন্য। দুনিয়ায় সুখ ভোগ করার জন্য। কিন্তু একজন মুমিন মুত্তাকীর জন্য দুনিয়া হচ্ছে জেলখানা। সে থাকে মুসাফির বেশে। তার আসল ঠিকানা তো

আখিরাতে। সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে না। তার দরকার আল্লাহর দয়া ও রহমত। আর আল্লাহর দয়া ও রহমত ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন। আর আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের উপর সব সময় দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন। আর তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ হয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত(বরকত) সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা আ'রাফ- ৯৬)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি সেটা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা আ'রাফ- ১৫৬)

নবী করীম (সা:) ছিলেন তাকওয়ার মূর্তপ্রতীক। মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন তিনি। এক হাদীছে তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী'। (বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫)

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাঁর নির্ধারিত সীমার অধিক সংরক্ষক'।

(আহমাদ হা/২৪৭০৭; ইরওয়াউল গালীল হা/২০১৫-এর আলোচনা দ্রঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮২-এর আলোচনা দ্রঃ।)

দুনিয়া ও আখিরাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাকওয়া। জীবনে চলার পথে ছোট থেকে বড় সকল বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা জরুরি। ঘুম থেকে উঠে আবার রাতে ঘুমাতে

যাওয়া অর্থাৎ সকল কাজ তাকওয়ার উপর হতে হবে। পানি খাওয়া, খাবার খাওয়া, ঘুমাতে যাওয়া, রিজিক তাল্লাশ করা, অন্যকে সাহায্য করা, হক আদায় করা, যাকাত দেয়া, দান করা, উত্তম আচরণ করা, নিজের জীবন পরিচালক, সন্তান প্রতিপালন সব কিছুই মাঝে থাকবে তাকওয়া। তবেই না একটা জীবন সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে।

অধ্যায়- ০৫ : তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

শরী‘আতে তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিমিত। তাকওয়ার কারণে মানুষের আচরণ পরিশীলিত হয়, ভাষা মার্জিত হয়, কর্মকাণ্ড সুন্দর হয় এবং তার দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করে। তাকওয়ার গুরুত্বের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(১) তাকওয়া অবলম্বন করা আল্লাহর নির্দেশ : তাকওয়া অবলম্বনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

‘আর নিশ্চিতভাবে আমরা আদেশ করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর’ (সূরা নিসা - ১৩১)।

এ আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে পূর্বাপর সকল মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অছিয়ত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। [কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)]

(২) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপদেশ হ’ল তাকওয়া অবলম্বন করা : রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছাহাবীদের প্রতি তাকওয়ার বিশেষ অছিয়ত ছিল। আতা ইবনে ইয়ামার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠান, তখন মু‘আয (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। নবী করীম (সাঃ) বললেন,

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ،

‘তোমার জন্য আবশ্যিক হ’ল তাকওয়া অবলম্বন করা’।[সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২০]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন,
عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ,

‘অবশ্যই তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে’।[তিরমিযী হা/৩৪৪৫; ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১]

এমনকি তিনি কোন সৈন্যদল প্রেরণের সময়ও তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন। সুলায়মান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) হ’তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ،
بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا

‘যখন কোন লোককে রাসূলুল্লাহ (সা:) কোন বাহিনীর আমীর করে পাঠাতেন তখন তাকে বিশেষ করে আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে মুসলিমদের সাথে সৎ ও কল্যাণময় আচরণের নির্দেশ দিতেন’।[মুসলিম হা/১৭৩১; তিরমিযী হা/১৪০৮]

এছাড়া ছাহাবীগণ উপদেশ চাইলেও তিনি তাকওয়ার উপদেশ দিতেন। ইরবায় ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন ফজরের ছালাতের পর আমাদের দিকে ফিরে বসে মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখ অশ্রুসজল হ’ল এবং অন্তর ভীত হ’ল। কোন একজন বলল, এ তো বিদায়ী নছীহত। হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আপনি আমাদেরকে আর কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ،

‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে’।[তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২]

(৩) তাকওয়া পূর্বসূরীদের অছিয়ত : নবী-রাসূলগণের পরে যুগে যুগে আল্লাহর সৎ বান্দাগণ তাকওয়ার অছিয়ত করতেন। আলী (রাঃ) বলেন,

أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل

‘আমি তোমাদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করার, শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করার এবং উদ্যম ও অলসতা উভয় অবস্থায় কর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি’।[ছা‘আলাবী, আল-ই‘জায় ওয়াল ঈ‘জায়, পৃ. ৪৩]

আতা ইবনু আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন, ওয়ালীদ ইবনু উবাদাহ ইবনে ছামেতকে মৃত্যুকালে তার পিতা উপদেশ দিয়ে বলেন,

يا بني، أوصيك بتقوى الله، واعلم أنك لن تتقي الله عز وجل حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان، ولن تبلغ العلم، حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره

‘হে বৎস! আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আর জেনে রাখ, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে ও ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহর প্রতি ও তারুদীরের ভাল-মন্দের প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনবে’।

আব্বাসীয় খলীফা আবু জা‘ফর আল-মানছুর স্বীয় সন্তান মাহদীকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

إِنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا التَّقْوَى، وَالسُّلْطَانُ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الطَّاعَةُ. وَالرَّعِيَّةُ لَا يُصْلِحُهَا،

‘তাকওয়া ব্যতীত খলীফা সফলতা অর্জন করতে পারে না, আনুগত্য ব্যতীত বাদশাহ সফল হয় না, ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত কোন কিছু জনসাধারণকে ঠিক করতে পারে না। ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করার অধিক যোগ্য, যিনি শাস্তি দানে অধিক যোগ্য। সবচেয়ে জ্ঞানহীন ঐ ব্যক্তি, যে তার অধঃস্তনের উপর যুলুম করে’। [ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/১২৬]

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে কিছু উপদেশ দিতে বললে তিনি বললেন,

اجْعَلِ التَّقْوَى زَادَكَ، وَأَنْصِبِ الْآخِرَةَ أَمَامَكَ

‘তুমি তাকওয়াকে সম্বল হিসাবে গ্রহণ কর এবং আখেরাতকে তোমার সম্মুখে স্থাপন কর’। [ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২০০।]

(৪) জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব : তাকওয়া মানুষকে পার্থিব জীবনের নানা জটিলতা থেকে মুক্ত করে, সংকট দূর করে, জীবিকা বৃদ্ধি করে, তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা যরুরী। আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বলেছেন,

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

‘তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর’। [তিরমিযী হা/১৯৮৭; আলবানী: ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৫৫]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه توعده

‘সৃষ্টির উপরে তাকওয়া অর্জন করা ওয়াজিব। যে ব্যাপারে আল্লাহ একাধিক স্থানে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে না আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন। আর যে তাকওয়া অর্জন থেকে অমুখাপেক্ষী হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়’। [শরহ্ উমদাতুল আহকাম ৩/৬২৭ পৃ.। গৃহীত. ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম, তাকওয়া, পৃ. ৯]

(৫) মুত্তাকী ছাড়া আমল কবুল করা হয় না : আমল কবুলের অন্যতম শর্ত হ’ল আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর জন্যই আমল করা। মহান আল্লাহ আদম সন্তানদের কুরবানী সম্পর্কে বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের নিকট থেকে কবুল করেন’(সুরা মায়েদাহ- ২৭)

আলী (রাঃ) বলেন,

كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقبل عمل مع التقوى، وكيف يقبل، عمل متقبل؟

‘তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দাও। কেননা তাকওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ’লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?’ [হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯]

(৬) তাকওয়া হিদায়াতের পথ দেখায় : মুমিনের অন্যতম চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথ। আর তাকওয়া সরল পথে চলা সহজ করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،

‘অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব’ (সুরা লাইল ৫-৭)।

যায়েদ বিন আসলাম বলেন, ‘সরল পথ’ বলতে জান্নাতের পথকে বুঝানো হয়েছে।[তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা লায়েল ৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.]
আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে কেবল তাকওয়াশীলরাই হেদায়াত লাভ করতে পারে।
মহান আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

‘এই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক’ (সূরা বাকারাহ - ২)।

(৭) কুরআন কেবল তাকওয়াশীলদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ : কুরআন উপদেশ গ্রন্থ। আর এই উপদেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার মধ্যে অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। আর কুরআন মুত্তাকীর জন্য উপদেশ গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

‘নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ’ (সূরা হাক্কাহ- ৪৮)

ইমাম তাবারী বলেন, ‘যারা ফরয আদায়ের মাধ্যমে ও পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে, কুরআন তাদের জন্যই উপদেশ গ্রন্থ’।[তাফসীরে তাবারী ২৩/৫৯৫, হাক্কাহ ৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র:]

(৮) তাকওয়া সকল সমস্যার সমাধান করে : আল্লাহভীতি অর্জন করলে মুত্তাকীর সকল সমস্যা আল্লাহ সমাধান করে দেন।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،

‘বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন’ (সূরা তালাক ২-৩)।

(৯) তাকওয়া পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে : দুনিয়ার কোন আইন, কোন প্রশাসন মানুষকে পাপ থেকে পরিপূর্ণরূপে বাঁচাতে পারে না। বরং আল্লাহর যথাযথ ভয়ই মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে। পূর্ব যুগে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের একজন তার প্রেমিকার সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মেয়েটি বলেছিল,

يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ،

‘হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর’।

এই কথায় যুবকটি আল্লাহকে ভয় করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়।[বুখারী হা/২৩৩৩, ৩৪৬৫]

(১০) তাকওয়া কর্মসমূহকে সংশোধন করে : তাকওয়াশীল ব্যক্তির কর্মকাণ্ড আল্লাহ সংশোধন করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ’লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন’। (সূরা আহযাব ৭০-৭১)

(১১) তাকওয়া উপকারী জ্ঞান লাভের মাধ্যম: পরহেযগার ব্যক্তিকে আল্লাহ উপকারী জ্ঞান দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (বিধান সমূহ) শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুত আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত’ (সূরা বাকারাহ- ২৮২)।

(১২) তাকওয়া বান্দার পাপ মোচন করে : তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং বান্দার পাপ মোচনের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

‘বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করেন ও তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করেন’ (সূরা তালাক- ৫)

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে ‘ফুরকান’ তথা সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল’ (সূরা আনফাল - ২৯)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

‘যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনতো ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, তাহ’লে আমরা অবশ্যই তাদের সকল পাপ মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে নে’মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম’ (সূরা মায়দাহ- ৬৫)।

এছাড়া আল্লাহ সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে আট শ্রেণীর লোককে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের একজন হলো আল্লাহভীরু পুরুষ ও নারী।

(১৩) তাকওয়াশীলরা রাসূল (সা:)-এর বন্ধু ও নিকটতর : আল্লাহভীরু ব্যক্তির যেমন আল্লাহর কাছে সম্মানিত, মানুষের কাছে নন্দিত বরিত তেমনি তারা রাসূল (সা:)-এরও নিকটতর লোক। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا،

‘আমার সবচেয়ে কাছের লোক তারাই যারা তাকওয়াশীল, তারা যেই হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন’।[আহমাদ হা/২২০৫২; ছহীহুল জামে হা/২০১২]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

إِنَّ أَوْلِيَّائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبُ مِنْ نَسَبٍ
'আমার বন্ধু হবে ক্বিয়ামতের দিন কেবল মুত্তাকীগণ। যদিও এক বংশ অন্য বংশের
চাইতে নিকটবর্তী হবে'।[আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯৭; ত্বাবরাণী কাবীর হা/৪৫৪৪]

(১৪) তাকওয়া সকল কল্যাণের মূল : পার্থিব জীবনে যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি হচ্ছে
তাকওয়া অর্জন করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক লোক তার নিকট
এসে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে এ
বিষয়ে তোমার পূর্বে বলেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু সাঈদ!

أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ
'আমি তোমাকে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তাকওয়াই হচ্ছে সব কিছুর
মূল'।[আহমাদ হা/১১৭৭৪; ছহীহাহ হা/৫৫৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৩]

(১৫) তাকওয়াশীলরাই বন্ধু হওয়ার যোগ্য : বন্ধুর চরিত্রেই মানুষ প্রভাবিত হয়ে উঠে।
তাই তাকওয়াশীলরাই বন্ধু হওয়ার যোগ্য। নবী করীম (সা:) বলেছেন,

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ،
'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন তাকওয়াশীল
লোক ব্যতীত কেউ না খায়'।[তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবূদাউদ হা/৪৮৩২; ছহীহুত
তারগীব হা/৩০৩৬।]

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

لَا تَعْتَرِضْ لِمَا لَا يَغْنِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقْوَامِ، وَلَا أَمِينٌ،

‘তুমি অনর্থক কোন কিছুতে জড়াবে না। তোমার শত্রুকে এড়িয়ে চলবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর তাকওয়াশীল ছাড়া কেউই বিশ্বস্ত নয়। তুমি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করবে না। অন্যথা সে তোমাকে পাপের বিষয় শিক্ষা দিবে এবং তাকে তোমার গোপনীয় বিষয় জানাবে না। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে তোমার বিষয়ে পরামর্শ করবে’।[মুছান্নাফ আব্দুর রায়যাক হা/৩৪৪৫০, সনদ হাসান, তাহকীক : আব্দুস সালাম বিন মুহসিন]

(১৬) তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা আল্লাহর নির্দেশ : তাকওয়া বা আল্লাহভীতির কাজে সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী’ (সুরা মায়েদাহ- ২)।

(১৭) তাকওয়ার পোষাকই সর্বোত্তম : মানুষের লজ্জাস্থান ঢেকে রেখে তাদের ইয়্যত-আব্রু রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ পোষাক নাযিল করেন। তবে তিনি তাকওয়ার পোষাককে উত্তম বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ

‘হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’

(সুরা আ‘রাফ - ২৬)।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন

خير الدنيا والآخرة في خمس خصال غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى،
والثقة بالله عز وجل على كل حال

‘দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাঁচটি বিষয়ে নিহিত থাকে। (১) মনের প্রাচুর্য (২) কাউকে কষ্ট না দেওয়া (৩) হালাল উপার্জন (৪) তাকওয়ার পোষাক এবং (৫) সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা’। [ইমান নববী, বুস্তানুল ‘আরেফীন, পৃ. ৩১]

(১৮) তাকওয়া বান্দার সর্বোত্তম পাথেয় : হজ্জের সফরের জন্য পাথেয় সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দানের পর তাকওয়ার পাথেয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى،

‘আর তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ’ল তাকওয়া’ (সুরা বাকারাহ - ১৯৭)।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন’। সে বলল, আরো বেশী দিন। তিনি বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বেশী দান করুন। তিনি বললেন, তিনি তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন, তুমি যেখানেই থাক’। [তিরমিযী হা/৩৪৪৪; ইবনু খুযাইমা হা/২৫৩২]

(১৯) তাকওয়াশীলরাই সর্বোত্তম : যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা নম্র-ভদ্র, সুন্দর ভাষা ব্যবহারকারী হয়। তারা কোন মানুষের উপরে যুলুম করে না। কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে না। মোটকথা তারা হয় সর্বোত্তম মানুষ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন,

كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ،
النَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِيْثَمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ،

‘প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হ’ল তাকওয়াশীল, পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নেই, নেই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা’।[ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; ছহীহাহ হা/৯৪৮]

(২০) ক্ষমতা লাভের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন: দুনিয়াতে আল্লাহ মুমিন ও নেক আমলকারীদেরকে যেমন খিলাফত দান করবেন, তেমনি তাকওয়াশীলকেও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَنُكَفِّرَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ,

‘তাদের পরে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় পায়’ (সূরা ইব্রাহীম - ১৪)।

মূসা (আঃ) তার কওমের লোকদের বলল, তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্যধারণ কর। এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল তাকওয়াশীলদের জন্যই’.. শ্রীঘ্নই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং জনপদে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন’ (সূরা আ‘রাফ ১২৮-১২৯)।

অধ্যায়- ০৬ : তাকওয়ার উপকারীতা

তাকওয়া (আল্লাহভীতি) হলো পাপ বর্জন করে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুত্তাকীদের সব কাজের সমাধান ও রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন, ঈমান মজবুত হয়, এবং জান্নাত লাভ নিশ্চিত হয়। এটি অন্যায় থেকে বিরত থাকার মানসিক শক্তি ও আত্মশুদ্ধি প্রদান করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার উম্মতকে তাকওয়া গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে:

فعن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي قال: سمعت رسول الله يخطب في حجة الوداع، فقال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم.

আবু উমামা সুদা ই ইব্ন আজলান আল-বাহেলী বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায়ী হজে খুতবা দিতে শুনেছি।

তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অর্জন কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, তোমাদের রমযানে সিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর তোমরা তোমাদের নেতাদের অনুসরণ কর , অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।"

অনুরূপভাবে তিনি যখন কাউকে যুদ্ধাভিযানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করতেন, তাকে তিনি বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া গ্রহণ করা ও মুসলিমদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করার অসিয়ত করতেন।

আমাদের আদর্শ পূর্ব পুরুষগণ তাদের চিঠি-পত্র, বয়ান-বক্তৃতা ও মৃত্যুর সময় তাকওয়ার অসিয়ত করতেন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তার ছেলে আব্দুল্লাহকে লেখেন: "অতঃপর... আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করার অসিয়ত করছি, যার সাথে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষাত করতে হবে। তিনি ব্যতীত তোমার কোন আশ্রয় নেই, তিনিই দুনিয়া-আখেরাতের মালিক।"

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকওয়া অর্জনকারী মুত্তাকীর সংজ্ঞায় বলেছেন: "মুত্তাকী তারা, যারা আল্লাহ ও তার শাস্তিকে ভয় করে।"

তালক ইবনে হাবীব বলেছেন: "তাকওয়ার অর্থ: আল্লাহর নির্দেশমতো তুমি তার আনুগত্য কর ও তার সাওয়াবের আশা রাখ এবং তার নির্দেশমতো তার নাফরমানী ত্যাগ কর ও তার শাস্তিকে ভয় কর।"

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নিম্নের বাণী:

اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴿١﴾ [آل عمران: ১০২]

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর , যথাযথ ভয়।" প্রসঙ্গে বলেন: তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা তার নাফরমানী না করা আল্লাহকে স্মরণ করা তাকে না ভুলা, তার শোকর আদায় করা তার কুফরী না করা।"

আপনি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করার ব্রত গ্রহণ করুন। মনে রাখুন তিনিই একমাত্র ভয় ও সম্মানের পাত্র। তাকে আপনার অন্তরের মণি কোঠায় বড়ত্বের মর্যাদায় আসীন করুন।

নিম্নে তাকওয়ার উপকারীতা উল্লেখ করা হলো:

১. তাকওয়া মানুষকে আল্লাহর বন্ধু বানায়: দুনিয়ায় আমাদের কতশত বন্ধু আছে। কিন্তু প্রকৃত বন্ধু খুজে পাওয়া দুষ্কর। এখন সবাই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলে বন্ধুত্ব করে। বিপদে পড়লে যারা পাশে থাকে তারা প্রকৃত বন্ধু। আর যার ভালো বা সৎ বন্ধু আছে সে তো ভাগ্যেবান। তবে সেই ব্যক্তি আরও বেশি সৌভাগ্যবান যে আল্লাহর বন্ধু হতে পেরেছে। জী, যে একবার আল্লাহর বন্ধু হয়েছে তার আর অন্য কোনো বন্ধুর প্রয়োজন নেই। আর একমাত্র তাকওয়াই মানুষকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন বা বন্ধু বানিয়ে দেয়। ইমানের সাথে তাকওয়া অবলম্বনকারীরাই আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু, যাদের পরকালে কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই। এটি আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

জেনে রেখো। নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (তারা হচ্ছে এসব ব্যক্তি) যারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা ইউনুস- ৬২, ৬৩)

২. তাকওয়া জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়: তাকওয়া মানে শুধু বাহ্যিক বেশভূষা নয়, বরং প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে “আল্লাহ আমাকে দেখছেন” এই চিন্তা নিয়ে পাপ বর্জন করা এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। কিন্তু যদি আল্লাহর ভয় না থাকে মনে, তবে পাপ থেকে বাচিবে কেমনে? আর পাপ থেকে দূরে না থাকলে গুনাহের কারণে যেতে হবে জাহান্নামে। জাহান্নাম যে বড়ই কঠিন আর কষ্টের যায়গা। কে বা যেতে চায় জাহান্নামে?? আমরা কেউ যেতে চাই না কঠিন আযাবে। কিন্তু আযাব থেকে রক্ষা পেতে কি করতে হবে সে বিষয়েও আমরা গাফেল। তবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি বান্দাকে ভালোবাসেন। তিনি চান না আমরা কেউ জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাই। তাই তিনি সতর্ক করেছেন আমাদের। তিনি বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا

তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকিনদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। (সূরা মারইয়াম- ৭১, ৭২)

এইখানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি মুত্তাকিনদের রক্ষা করবেন। আর মুত্তাকি কারা? যারা আল্লাহর ভয় অন্তরে লালন করে। অতএব, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহকে ভয় করা আর তার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা।

৩. তাকওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম: তাকওয়া হলো জান্নাত লাভের প্রধান চাবিকাঠি এবং মুমিনের জীবনের মূলভিত্তি। জান্নাত কে না পেতে চায়? সবাই চায় জান্নাতের অধিবাসী হইতে। তবে পরকালে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদ, আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি মুমিন মুত্তাকিনদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আল্লাহ নিজে ওয়াদা করেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। আর আল্লাহর ওয়াদা সর্বদা সত্য। তিনি বলেন,

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা যুমার- ৭৩)

৪- তাকওয়া শয়তানের ধোঁকাবাজি ধরিয়ে দেয়: আমাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান এবং আমাদের নফস। শয়তান মানুষের মনে বিভিন্নভাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আর আমাদের মন বা নফস সেই কুমন্ত্রণা অনুযায়ী শয়তানের অনুসরণ করে। তবে কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার অন্যতম পথ হ'ল তাকওয়া।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। (সূরা আ'রাফ- ২০১)

অর্থাৎ যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকতে চায় তাদের মনে যদি কখনো অসৎ চিন্তার সামান্যতম স্পর্শও লাগে, তাহলে তা তাদের মনকে ঠিক তেমনিভাবে আহত করে যেমন চোখে বালি পড়লে মানুষ যন্ত্রণাবোধ করে। তাদের বিবেক জেগে উঠে এবং তারা অসৎ প্রবণতার এ ধূলোমাটি ঝেড়ে ফেলার কাজে লেগে যায়। অন্যদিকে যারা আল্লাহকে ভয় করে না, অসৎকাজ থেকে বাঁচতেও চায় না এবং শয়তানকে সাথে রেখে চলে, তাদের মনে অসৎ চিন্তা ও অসৎ উদ্দেশ্য পরিপক্বতা লাভ করতে থাকে এবং তারা এসব পঁচা দুর্গন্ধময় আবর্জনায় কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব করে না।

৫- তাকওয়া সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর : কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, যা ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে। আর তাকওয়াশীলকে আল্লাহ তা'আলা এই পার্থক্যকারী শক্তি দান করেন। এখন সত্যকে সবাই চাপা দিতে চায়। চারদিকে মিথ্যার ছড়াছড়ি। নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য সত্য গ্রহণ করতেও চায় না কেউই। মিথ্যা বলে চাকরি নেয়া, হারাম পথে ইনকাম করে, অসৎ উপায় অবলম্বন করে, অন্যায় করে। কিন্তু তাকওয়াবান ব্যক্তি কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। কুরআনে

যা হারাম করা হয়েছে তা তারা একদম বাতিল বলে গণ্য করে আর যা হালাল করা হয়েছে তা আক্রে ধরে। তাই তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়। (সূরা আনফাল- ২৯)

এই আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় যে, আল্লাহ বলছেন- যদি তোমরা দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে এমন পার্থক্যকারী শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন, যার ফলে তোমরা পদে পদে জানতে পারবে যে, কোন কর্মনীতিটা ভুল এবং কোনটা নির্ভুল। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি বলে দেবে যে, কোন দিকে চলা উচিত এবং কোন দিকে চলা উচিত নয়। কোনটি প্রকৃত সত্যের পথ, যা আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং কোনটি মিথ্যা ও অসত্যের পথ, যা শয়তানের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়। আর আল্লাহ তাকওয়াবানদের ই শুধু এই নিয়ামত দিয়ে থাকেন।

৬- তাকওয়া উন্নতি লাভের উপায়: প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তিনি কতক স্থানে, কতক সময়ে, কতক বস্তুতে ও কতক কাজে বরকত রেখেছেন। তাকওয়া বরকত ও উন্নতি লাভের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَىٰ مَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সকল কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ- ৯৬)

অধ্যায়- ০৭ : সকল নবীই তাকওয়া অবলম্বনের দাওয়াত দিয়েছেন

নূহ (আঃ) এর দাওয়াত: নূহ (আঃ) এর যুগের মানুষেরা ছিল অত্যন্ত অবাধ্য, অত্যাচারী এবং তারা মূর্তি পূজা করত। নূহ (আঃ) তাঁর অবাধ্য জাতিকে মোট ৯৫০ বছর ধরে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যাক লোক তার দাওয়াত গ্রহণ করেছিল। তবুও তিনি মেহনত চালিয়েই যান। কুরআনে এসেছে,

- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শু'আরা, ১০৫-১০৮)

হুদ (আঃ) এর দাওয়াত: আদ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিল শক্তিশালী আর অবাধ্য। আদ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল হুদ (আঃ) কে। তিনি তার সম্প্রদায়কে তাকওয়ার দাওয়াত দেন। আল্লাহ বলেন,

كَذَّبَتْ عَادِی الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودًا لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শু'আরা, ১২৩-১২৬)

সালেহ (আঃ) এর দাওয়াত: সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল সালেহ (আঃ) কে। তাঁর কওমেরা পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল। পরবর্তীকালে

সালেহ (আঃ) এসে তাদের দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। তাঁর মেহনত নিয়ে আল্লাহ বলেন,

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَانْقُوا
اللَّهُ وَأَطِيعُوا

সামুদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শু'আরা, ১৪১-১৪৪)

লুত (আঃ) এর দাওয়াত: লুত (আঃ) এর সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত পাপাচারী, নির্লজ্জ এবং সীমালঙ্ঘনকারী জাতি, যারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করতো। তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল লুত (আঃ) কে। লুত (আঃ) তাদের বারবার সতর্কবার্তা ও উপদেশ দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করত এবং উল্টো নবীকে তাদের শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
فَانْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

লুতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শু'আরা, ১৬০-১৬৩)

শুয়াইব (আঃ) এর দাওয়াত: আইকাবাসীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল শুয়াইব (আঃ) কে। আইকাবাসীরা ছিল ঘন বনাঞ্চলে বসবাসকারী এবং তারা ছিল জালেম এবং ব্যবসায়ে মাপে কম দেয়ার রোগে আক্রান্ত ছিল। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত না। তারা শুয়াইব (আঃ) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তার কথা উল্লেখ করে বলেন,

- كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

আইকাবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল, যখন শুয়াইব তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভা করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শু'আরা, ১৭৬-১৭৯)

ইলিয়াস (আঃ) এর দাওয়াত: ইলিয়াস (আঃ) তার সম্প্রদায়কে তাকওয়া অবলম্বন করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِلا تَتَّقُونَ

নিঃসন্দেহে ইলিয়াস ছিলেন রাসূলদের মধ্যে অন্যতম। স্মরণ করো, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? (সূরা সাফফাত- ১২৩, ১২৪)

মুসা (আঃ) এর দাওয়াত: মুসা (আঃ) কে মূলত মিশরের অত্যাচারী শাসক ফেরাউন এবং তার কওম বনী ইসরাঈলের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বনী ইসরাঈল ছিল প্রাচীন যুগের এক বিশেষ জাতি, যাদের আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি ও নেয়ামত দান করেছিলেন। তবে তারা স্বভাবগতভাবে অবাধ্য, গোঁয়ার এবং নবি- রাসুলের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারী ছিল, যার ফলে তারা বারবার আল্লাহর আযাব ও অভিশাপের সম্মুখীন হয়েছেন। এরপর তাদের কাছে আসে মুসা (আঃ)। তিনি বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে বাঁচাইতে আশ্রয় চেষ্টা করেন। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اتَّبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ

স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়- ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও। তারা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (সূরা শু'আরা- ১০, ১১)

ঈসা (আঃ) এর দাওয়াত: মুসা (আঃ) পর বনি ইসরাঈল তথা ইহুদি জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) কে। তিনি বনী ইসরাঈল বংশের সর্বশেষ নবি ও কিতাবধারী রাসুল ছিলেন। তিনি সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন তার কওমকে। এক আল্লাহকে ভয় করার আর উনার শাস্তির ভয় করার তাগিদ দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন,

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

আমি তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন সহকারে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো। (সূরা আলে ইমরান- ৫০)

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দাওয়াত: আমাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। উনার পর আর কোনো নবি আসেনি আসবেও না কখনো। তিনি সর্বদা আল্লাহকে ভয় পেতেন। আল্লাহ উনার পূর্বের পরের সকল গুনাহ আগেই মাফ করে দিলেও উনার মাঝে তাকওয়া ছিল সব চেয়ে বেশি। তবুও তিনি আল্লাহর আযাবের ভয়ে কাদতেন। বেশি বেশি ইবাদত করতেন, ইস্তেগফার করতেন। প্রতিটি নবিকে পাঠানো হয়েছিল নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের কাছে, কিন্তু রাসুল (সাঃ) কে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য না বরং পুরো মানবজাতি এবং জীন জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি সর্বদা উম্মতের ফিকির করতেন। তিনি নিজে সরল-সঠিক পথে থেকেছেন এবং সবাইকে সরল সঠিক পথে থাকার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى

তুমি কি দেখেছ, যদি তিনি সৎপথে থাকেন অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেন (তবে এটা কতই না ভালো হতো)। (সূরা আলাক- ১১, ১২)

অধ্যায়- ০৮ : তাকওয়ার পুরস্কার

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ, যার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। এর প্রধান পুরস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে-জীবনের কঠিন সময়ে আল্লাহ কর্তৃক পথ খুলে দেওয়া, অভাবনীয় উৎস থেকে রিয়ক প্রাপ্তি, পাপ মোচন, সমস্ত কাজে সফলতা ও সহজতা, এবং চূড়ান্ত পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভ।

আমরা দুনিয়াতে মানুষের ভালোবাসা পাবার জন্য কতো কিছুই না করি। আমাদের প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্য পেতে আমাদের কতশত চেষ্টা, কত রকমের আয়োজন। আমরা তাদের সাথে সময় কাটাইতে চাই, তারা যা পছন্দ করে সেটাই করতে চাই বা করি। তাদের ভালোবাসা পেতে ভালো ভালো উপহার দেই। কতো রকমের বাহানা বানাই। কিন্তু আমরা কি কখনো আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে এতো চেষ্টা করেছি বা করি? যতটা স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি করি! আল্লাহর ভালোবাসা পেতে কখনো কি উনার পছন্দের বান্দা হওয়ার চেষ্টা করেছি? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু যদি উত্তর না হয় তবে করণীয় কি?

আল্লাহ কি বলেছেন জানেন? আল্লাহ বলেছেন উনার ভালোবাসা পেতে হলে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। মুত্তাকী হইতে হবে। সকল ক্ষেত্রে সবার আগে আল্লাহকে প্রাধান্য দিতে হবে তবেই আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা তাওবা-৭)

আমরা সব সময় চাই আমাদের প্রিয় মানুষ গুলো আমাদের আশে পাশে থাকুক। সুখে দুঃখে তাদেরকে কাছে চাই। কিন্তু সব সময় কি তাদেরকে আমরা পাশে পাই? বাস্তবিক অর্থে তাদের খুব কম ই পাওয়া যায়। তবে আমাদের পাশে সব সময় থাকে আমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালা। আর যারা মুত্তাকি আল্লাহ সর্বদা তাদের পাশে থাকেন।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

জেনে রেখো। আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা তাওবা- ৩৬)

আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন এইটা কোনো সাধারণ সাহচর্য না। এইটা এমন একটা সাহায্য যা টাকা, ক্ষমতা বা মানুষের সংখ্যা দিয়ে কেনা যায় না। এটা অর্জন হয় শুধু মাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে। আর আল্লাহ যখন কারো সাথে থাকেন তখন তার আর ভয় থাকে না। মানুষের কথা, একাকিত্ব, ব্যবসায় লস, হতাশা এগুলো কিছুই তাকে ভেংগে দিতে পারে নাহ। ইতিহাসে নবি রাসুল থেকে শুরু করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই একটা বিশ্বাসের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।
(সূরা নাহল- ১২৮)

তাই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে সাথে সৎ কাজ করতে হবে।

আবার একটা বাস্তব সত্যি কথা জানাই। তা হচ্ছে যখন আমরা বিপদে পড়ি তখন আমরা সাহায্য চাই সৃষ্টিকূলের কাছে। কিন্তু বিপদে পড়লে আগে সাহায্য চাওয়া দরকার সেই মহান রবের কাছে। যিনি সকল বিপদ দূর করার ক্ষমতা রাখেন। যাদের মাঝে আল্লাহর প্রতি ভরসা নেই তারা বিপদে একটুতেই হতাশ হয়ে যায়, ভরসা হারিয়ে ফেলে। অধৈর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যারা মুত্তাকি তারা সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, হতাশ হয় না, আস্থা হারিয়ে ফেলে না। বরং আল্লাহর সাহায্যের জন্য সবর করে। তারা সব সময় আল্লাহ কাছে সাহায্য চায়। কারণ তারা জানে আল্লাহ রহমানুর রহিম। আর আল্লাহ তায়ালাও সব সময় তাদের সাথে থাকেন এবং সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে,

وَإِنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

অতঃপর যারা মুমিন ও মুত্তাকী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (সূরা নামল- ৫৩)

আমরা বিপদে বা অভাবের সময় হু হতাশ করতে থাকি। সাহায্যের জন্য এদিক সেদিক ছোটাছুটি করি। কিন্তু মুত্তাকী ব্যক্তির সর্ব সময় সর্ব করেন। কারণ তারা জানেন যে, যে কোনো সংকটের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য। তাই আসুন, আমরা সর্ব সময় তাকওয়া অবলম্বন করি আর সর্বরের সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (সংকট থেকে বের হওয়ার) পথ বের করে দেন।
(সূরা তালাক- ২)

আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজকর্ম সহজ করে দেন। (সূরা তালাক-৪)

এই আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের কাজ কর্ম সহজ করে দেন। দুনিয়ায় বসবাস কালে আমাদের বিভিন্ন কাজ করতে হয়। অতিরিক্ত কাজে পেরেশান হয়ে যাই। ইবাদতে অলসতা চলে আসে। নফসের ধোকায় পরে যাই। কোনো কাজ করতে গেলে বরকত না থাকলে সেই কাজ করতে সময় বেশি লাগে। তখন আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই। আল্লাহর সাহায্য না পেলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। সকল কাজে, সফলতায় আল্লাহর রহমত ও বরকত কে না চায়? তাই আমরা যদি আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে চলি তাহলে আল্লাহ আমাদের সকল কাজকে সহজ করে দিবেন। ভালো কাজ গুলোকে আল্লাহর গায়েবি সাহায্যে মাধ্যমে আমরা সহজেই হাদিল করতে পারব ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা দিয়েছেন, যারা মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। দুনিয়াতে তো আমরা অনেক পুরস্কার পাই, সেগুলো পুরস্কার আর আল্লাহর পুরস্কার কি এক হতে পারে কখনো? কখনোই নাহ। দুনিয়াতে এতো এতো পড়াশুনা করলে, ডিগ্রি অর্জন করলে, সরকারি চাকরি করলে, বড় বাড়ি, সুন্দর গাড়ি, অনেক ক্ষমতা আর কোটি কোটি টাকা থাকলে তাদেরকে আমরা বলি সফল। কিন্তু আসলেই কি তারা সফল? না তারা সফল নাহ। আমরা সফলতার সংজ্ঞা ভুল জানি। বরং সফল তারাই

যাদেরকে আল্লাহ পরকালে সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে জান্নাত দান করেছেন। সেটিই সফলতার আসল সংজ্ঞা। আর জান্নাত ই মহা পুরস্কার।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। (সূরা তালাক-৫)

আল্লাহ আরও বলেন, মুত্তাকিনদের যথাযথ সম্মান দেয়া হবে।

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

নিশ্চয় যে তাত্ত্বওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্যশীল হয়, আল্লাহ এমন সংকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (সূরা ইউসুফ- ৬০)

মুত্তাকিনদের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা হুদ- ৪৯)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর- ৫২)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা ও বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ। আর তা মুত্তাকীদের জন্যই নির্মিত হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান- ১৩৩)

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

এবং যে সমস্ত ব্যক্তির স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং নিজের নফসের খারাপ চাহিদা থেকে বিরত থাকে, তাদের ঠিকানাই হলো জান্নাত। [সূরা নাজিআত, ৪০-৪১]

কত আশ্চর্যজনক শব্দ বর্ণনা করেছেন! বলেছেন যে, ব্যক্তি নিজের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে যে, আমাকে কোনো এক সময় আমার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে, তখন কোন মুখে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াব? এই ভয় এমন কঠিনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, এই ভয়ের ফলে সে নিজের নফসকে নাজায়েজ খাহেশাতের ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকে। এমন মানুষের ঠিকানা জান্নাত এবং এমন মানুষের জন্যই জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে।

মুত্তাকীরা কই থাকবে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

সেদিন মুত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে। (সূরা যারিয়াত- ১৫)

আল্লাহ জান্নাতের বর্ণনায় বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকবে বাগান ও ঝর্ণাধারার মাঝে। (সূরা ক্বামার- ৫৪)

উপরিউক্ত আয়াত গুলো থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ভয় আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকলে আল্লাহ আমাদের এতো এতো পুরস্কার দিবেন। শুধু দরকার আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য, মেহনত, সবর, সৎ কর্ম, গুনাহ বর্জন, ইমান আকিদা ঠিক রেখে সঠিক ভাবে আমল করা।

অধ্যায়- ০৯ : তাকওয়া অর্জনের উপায়

আল্লাহর ইবাদাত করা:

এরপরে যখন এই ভয়ের মধ্যে অগ্রগতি হয়, তখন এরপরে এই ভয় শুধুমাত্র এ কথার নয় যে, আমাদের থেকে গুনাহ না হয়। বরং এরপরে এই বিষয়েরও ভয় সৃষ্টি হয় যে, যখন ইবাদাত করেছি, এটা আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী হচ্ছে কিনা? এই ইবাদাত আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করার উপযুক্ত হচ্ছে কিনা? কেমন যেন ওই ব্যক্তি এমন আমল করেছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিদায়ক। কিন্তু এর পরেও ভয় পাচ্ছে যে, এই আমল আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী হচ্ছে কিনা? এই আমলে কোনো বেয়াদবি আছে কিনা? এ কারণে বুজুর্গরা বলেছেন যে, একজন মুমিনের কাজ হলো যে, আমল করতে থাকবে এবং ভয় পেতে থাকবে। কুরআনুল কারিম ইরশাদ হয়েছে—

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

রাত্রিবেলা তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে এবং আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করতে থাকে। কিন্তু ওই সময়েও অন্তর ভয় শূন্য থাকে না। [সূরা সিজদা- ১৬]

বরং স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয়ের সঙ্গে ডাকতে থাকে যে, জানা নেই যে, আমার এই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করার উপযুক্ত হচ্ছে কিনা?

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মানবসমাজ। তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (সূরা বাকারাহ- ২১)

আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা:

আল্লাহর আমিন বা শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলাই এর মূল লক্ষ্য। নিজে আল্লাহর আইন মানতে হবে এবং তাঁর আইন, নিয়ম, হুকুম, আহকাম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। (এ পদ্ধতির মাধ্যমে) তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে। (সূরা বাকারাহ- ১৭৯)

রোযা রাখা:

বর্তমানে মানুষ কত ফাসেক, ফাজের এবং গুনাহগার হয়েছে। কিন্তু এরপরেও রমজান মাসে রোজা রাখছে। এখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। অনেক পিপাসা লেগেছে। জবান বাহিরে বের হয়ে এসেছে। রুম বন্ধ হয়ে আছে, রুমের মধ্যে একা বসে আছে। অন্য কোনো ব্যক্তি কাছে নেই। রুমে ফ্রিজও আছে। ফ্রিজের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি রাখা আছে। ওই সময় এই মানুষের নফস এটা চাইতেছে যে, এই প্রচণ্ড পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করবে। কিন্তু বর্তমানে এই সময়েও কি কোনো মুসলমান এমন আছে যে, ওই সময় ফ্রিজ থেকে পানি বের করে এক গ্লাস পানি পান করে নিবে? সে কিছুতেই পানি পান করবে না। অথচ, যদি সে পানি পান করে, তাহলে কোনো মানুষের কানে এই খবর পৌঁছবে না। কোনো মানুষ তাকে তিরস্কার করবে না। এমনকি দুনিয়াবাসীর সামনে সে রোজাদার হিসেবেই বিবেচিত হবে। সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হয়ে মানুষের সঙ্গে ইফতার খেয়ে নিল। তখন কোনো ব্যক্তি বুঝতেই পারবে না যে, সে রোজা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পানি পান করেনি। এখন বলুন তো, ওটা কি জিনিস? যা তাকে বন্ধ রুমে পানি পান করা থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া অন্য কি জিনিস, যা তাকে বিরত রাখতে পারে? যেহেতু আমাদের রোজা রাখার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এ কারণে এই অভ্যাসের ফলে ওই ভয়ও চলে এসেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারাহ- ১৮৩)

সলাত কায়েম করা:

সলাত নিজে পড়া আর কায়েম করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আমরা যখন সলাত পড়ি তখন তা আদায় করা হয়। কিন্তু কায়েম করা মানে সলাত প্রতিষ্ঠা করা। আর সলাত প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজে তা আদায় করতে তো হবেই সাথে পরিবার ও সমাজের মানুষকে আদায় করার তাগিদ দিতে হবে। আর মুত্তাকি ব্যক্তির নিজেরা সলাত পড়ে বরং প্রতিষ্ঠা করে।

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

সলাত কায়েম করো এবং তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় করো। তিনিই তো সেই সত্তা, যার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম- ৭২)

কুরআন বুঝে পড়া:

কুরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। তাকওয়া অর্জন করতে হলে কুরআনকে নিজের সাথী বানিয়ে নেয়া। সহিহ শুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত করা। আর কুরআন কি বলছে এর মর্মার্থ বুঝা। আল্লাহর আদেশ--নিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর যখন আমরা কুরআনকে অন্তরে ধারণ করতে পারব তখন তাকওয়া অর্জন করাও সহজ হবে।

قَرَأْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَرَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

এ কুরআন আরবি ভাষায় (অবতীর্ণ করা হয়েছে), এতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই। (এর মাধ্যমে) তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। (সূরা যুমার- ২৮)

সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকা:

কথায় আছে - সৎ সঙ্গে সর্গে বাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কথাটা খাটি সত্য। কেননা সঙ্গ ভালো হইলে তা আমাদের ভালোর পথে নিয়ে যায়, আর সঙ্গ খারাপ হইলে তা আমাদের খারাপ এর দিকে নিয়ে যায়। মুত্তাকী ব্যক্তিগণ সত্যবাদী হয়ে থাকে। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস রাখে। আর তাদের সঙ্গী-সাথীরাও সত্যবাদী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সূরা তাওবা- ১১৯)

সঠিক পথের অনুসরণ করা:

মুত্তাকীরা সব সময় সরল সঠিক পথ অবলম্বন কর। তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে আল্লাহ ও রাসুলের দেখানো পথে চলতে হবে।

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا النَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكَمِ وَضَاكُم
নতুবা به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা আন'আম- ১৫৩)

রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করা:

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআন দিয়েছেন আমাদের শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে। তিনি অনেক সুন্দর করে কুরআনকে আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কুরআন ভালো ভাবে বুঝার জন্য হাদিস [রাসুল(সা:) এর কথাকে বলে]

দরকার হয়। তাকওয়া অর্জন করতে হলে কুরআন হাদিস দুটাই মানতে হবে। রাসুলের সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে।

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। (সূরা হাশর- ৭)

মহিলাদের পর্দা করা:

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ। যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা সঠিক ভাবে পর্দা করে। কারণ পর্দা না করার কারণে অনেক গুনাহ সংঘটিত হয়।

يَا نِسَاءَ الْاَلْبِي لَسْتُنَّ فَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কোন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কথা বলার সময় এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না, যাতে করে যার অন্তরে (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে লালায়িত হয়। আর তোমরা (কথা বলার সময়) ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাথমিক জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব- ৩২, ৩৩)

যার ভেতরে তাকওয়া রয়েছে, খোদাভীতি রয়েছে, তারাই প্রকৃত সফল। দুনিয়ার জীবনেও তারা সফল, আর আখিরাতে তো তাদের জন্য চিরস্থায়ী সফলতা অপেক্ষা করছেই। কিন্তু যেসব বোন পর্দার বিধানকে মনে করেন সেকেলে, যারা ইসলামের এই ফরজ বিধানকে অবজ্ঞা করেন, যারা ইসলামের গন্ডির বাহিরে গিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত

করে দিতে চান, তাদের ভিতর তো খোদাভীতি নেই সুনিশ্চিতভাবে। কারণ, তাদের ভিতর যদি তাকওয়া থাকতই, তাহলে তারা এই দুঃসাহস কখনোই করতে পারত না।

সঠিক কথা বলা:

তাকওয়া অর্জন এর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সঠিক কথা বলা। আজকাল চারপাশে যেনো মিথ্যার ছড়াছড়ি। কথায় কথায় আমরা মিথ্যা বলি। মিথ্যা বলাকে কিছুই মনে করি না। কিন্তু মুত্তাকী হইতে গেলে সর্বদা সঠিক সত্য কথা বলতে হবে। সঠিক কথা বলার হিম্মত রাখতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُوا قَوْلًا سَدِيدًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। (সূরা আহযাব- ৭০)

কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থাকে ভয় করা:

মুমিন মুত্তাকি সব সময় তার মালিকের ভয়ে ভীত থাকে। তারা যখন কুরআনে কবর, কিয়ামত, হাশর, পুলসিরাত এগুলার আয়াত পড়ে তখন ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ সামনে দাড়ানোর ভয় তাদের মাঝে সব সময় বিরাজমান। কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন খুবই ভয়ংকর। (সূরা হজ্জ- ১)

নিজের আমল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা:

আমরা মুসলিম হিসাবে কম বেশি সবাই ইবাদত করি। কিন্তু তাকওয়া অর্জন করার একটা উত্তম উপায় হচ্ছে নিজের করা আমল ইবাদত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। কেননা আমল যদি আল্লাহ হুকুম ও রাসুলের(সা:) দেখানো নিয়মে না হয় তাইলে তা কবুলযোগ্য

নয়। প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে নিজেই নিজের আমল এর হিসাব নেয়া। নিজেই নিজের আত্মসমালোচনা করা। গতকালের থেকে আজকের আমল বেশি নাকি কম? সারাদিনের ভালো কাজ, নিজের করা গুনাহ, নামাজে খুশুখুজি ছিল কিনা?, লোক দেখানো কোনো কাজ করেছি কিনা?, কটু কথা বলেছি কিনা?, মিথ্যা বলেছি কিনা?, রাগ বা খারাপ আচরণ করেছি কিনা?, কারো হক নষ্ট করেছি কিনা? এই সব কিছু নিয়ে চিন্তা করা, তাহলে আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগবে। আর সাথে সব সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক মানুষেরই ভেবে দেখা উচিত যে, সে আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য কী পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। (সূরা হাশর- ১৮)

অধ্যায়- ১০ : তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

এ পর্যায়ে আমরা তাকওয়া ভিত্তিক বিভিন্ন ঘটনাবলি জানব। নিজেদের মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি জানব ইনশাআল্লাহ।

এরই নাম তাকওয়া

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং এই বিষয়ের ভয় রাখে যে, একদিন আমাকে আমার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আমার প্রতিটি আমলের জবাব দিতে হবে, তার জন্য দুইটি জান্নাত রয়েছে। [সূরা রহমান, আয়াত : ৪৬]

এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হজরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, এই আয়াতে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার অন্তরে কোনো খারাপ কাজ

করার চিন্তা এসেছে যে, আমি গুনাহ করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ধ্যান করে নিয়েছে এবং এই কথা স্মরণ হয়েছে যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে। এই স্মরণ হওয়ার পরে সে গুনাহর ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েছে এবং গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য দুইটি জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। এরই নাম তাকওয়া।

এরপরে এ আয়াতের আরও তাফসির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি নির্জনে আছে। সেখানে কেউ তাকে দেখছে না। যদি সেখানে সে কোনো গুনাহ করতে চায়, তাহলে বাহ্যিকভাবে গুনাহ করার কোনো প্রতিবন্ধক নেই। এই নির্জনতায় তার অন্তরে গুনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই নির্জনতায় সে এটা চিন্তা করেছে যে, যদিও কোনো মানুষ আমাকে দেখছে না। কিন্তু আমার আল্লাহ দেখছেন। একদিন আমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে। এই খেয়াল আসার পরে ওই ব্যক্তি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য এই আয়াতের মধ্যে দুইটি জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। আর এরই নাম হলো "তাকওয়া"। যে মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করে নিজের আকাঙ্ক্ষা চাই সেটা যত শক্তিশালী হোক না কেন, ছেড়ে দিবে এবং এই চিন্তা করবে যে, যদিও দুনিয়ার কেউ দেখছে না কিন্তু আমার আল্লাহ দেখছেন। সমস্ত তরিকত এবং সমস্ত শরিয়তের খোলাসাও হলো এটাই যে, অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় এসে যাবে যে, আমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এটা বলেননি যে, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় পাবে অথবা আজাবকে ভয় পাবে অথবা আগুনকে ভয় পাবে। বরং এটা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় পরওয়ারদিগারের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে। যার অর্থ হলো যে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব আছে যে, সেটা চিন্তা করছে চাই আল্লাহ তাআলা এই গুনাহের শাস্তি দিক অথবা না দিক, কিন্তু আমি এই আমল নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে কিভাবে দাঁড়াব? যে ব্যক্তির অন্তরে অন্যের বড়ত্ব আছে, চাই তার এই আশঙ্কা না থাকুক যে, সে আমাকে মারবে অথবা শাস্তি দিবে। কিন্তু তার বড়ত্ব ও শ্রদ্ধার কারণে তার এই ভয় থাকে যে, আমি তাঁর সন্তুষ্টির বিপরীতে কোনো কাজ করে তার সামনে গিয়ে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াব? এই ভয়ের নামই হলো 'তাকওয়া'।

দুধে পানি মেশানোর ঘটনা

ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু শাসনামলে তিনি মানুষের অবস্থা জানার জন্য রাত্রিবেলা ঘোরাফেরা করতেন। যদি কারও ব্যাপারে জানতেন যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষে আছে, তখন তাকে সাহায্য করতেন। যদি তিনি জানতেন যে, অমুক ব্যক্তি কোনো মুসিবতে আছে, তাহলে তাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করতেন। আর যদি কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখতেন, তাহলে তাকে সংশোধন করতেন। অনুরূপভাবে, একদিন তিনি তাহাজ্জুদের সময় মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরছেন। একটি ঘর থেকে দুজন নারীর কথা বলার আওয়াজ আসছে। আওয়াজের কারণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, একজন নারী বৃদ্ধা এবং একজন যুবতি। ওই বৃদ্ধা নারী তার যুবতি মেয়েকে বলেছিল যে, বেটি! তুমি যে দুধ দোহন করেছ, এতে পানি মিলিয়ে দাও। যাতে দুধ বেশি হয়ে যায়। এরপরে এটাকে বিক্রি করব। মেয়ে উত্তর দিল যে, আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আদেশ জারি করেছেন যে, কোনো দুধ বিক্রেতা দুধের মধ্যে পানি মিলাবে না। এ কারণে আমি পানি মিলাতে চাই না। উত্তরে মা বলল, বেটি! আমিরুল মুমিনিন এখানে বসে নেই। যদি তুমি পানি মিলিয়ে দাও, তাহলে কে তোমাকে দেখবে? সে তো তার ঘরে আছে। ওই সময় রাত অন্ধকার ছিল। কেউ দেখছিল না। এ কারণে তিনি কিভাবে জানবেন যে, তুমি পানি মিলিয়ে দিয়েছো? উত্তরে মেয়ে বলল, আম্মাজান! আমিরুল মুমিনিন তো দেখছেন না। কিন্তু আমিরুল মুমিনের হাকিম অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তো দেখছেন। এজন্য আমি এই কাজ করতে পারবো না। দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সমস্ত কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন সকাল হলো তখন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু জেনে নিলেন যে, এই মহিলা কে? জানার পরে এই মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের বিবাহের পায়গাম পাঠালেন। এরপরে তার সঙ্গে নিজ ছেলের বিবাহ দিয়ে দিলেন। এই বিবাহের ফল এই হলো যে, ওই মেয়ের খান্দানে তাঁর নাতিদের মধ্য থেকে হজরত ওমর ইবনু আব্দুল আজিজ জন্মগ্রহণ করলেন। যাকে মুসলমানদের পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ বলা হয়। মোটকথা, এই কথা ওই মেয়ের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে যে, যদিও আমিরুল মুমিনিন দেখছেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো দেখছেন। অথচ নির্জনতা এবং রাতের অন্ধকার ছিল এবং কেউ দেখছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা দেখছেন। সুতরাং এরই নাম হলো 'তাকওয়া'।

শিক্ষণীয় ঘটনা - ০১

একবার হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কিছু সাথীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারার বাহিরের কোনো এলাকায় গেলেন। একজন বকরির রাখাল তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। যে রোজাদার ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দ্বীনদারী পরীক্ষা করার জন্য, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি তুমি এই বকরির পাল থেকে একটা বকরি আমার কাছে বিক্রি করে দাও, তাহলে এর মূল্য তোমাকে দিয়ে দেবো এবং বকরির গোশতের মধ্য থেকে এতটুকু গোশত তোমাকে দেবো, যার মাধ্যমে তুমি ইফতার করতে পারবে। সে উত্তরে বলল, এই বকরি আমার নয়, বরং আমার মালিকের। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তার একটি বকরি হারিয়ে যায়, তাহলে সে কি জানতে পারবে? এটা শুনে রাখাল মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং আসমানের দিকে আঙুল উঠিয়ে বলল যে- **فأين الله** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোথায় গিয়েছেন? এবং এটা বলে রওনা করল। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাখালের এই বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে ওই রাখালের মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার থেকে বকরিগুলো ক্রয় করলেন এবং রাখালকেও ক্রয় করলেন। এরপরে রাখালকে আজাদ করে দিলেন এবং সমস্ত বকরি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন।

স্মরণ রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, যা এই রাখালের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন, ওই সময় পর্যন্ত দুনিয়া থেকে অপরাধ শেষ হবে না এবং খারাপ শিরোনাম শেষ হতে পারে না। চাই অপরাধ নির্মূল করার জন্য পুলিশের পাহারা বসাও, চাই যতই আদালত বানাও। এ কারণে যে, এই পুলিশ এবং এই আদালত বেশি থেকে বেশি দিনের আলোতে এবং শহরের জনবসতিতে মানুষদেরকে অপরাধ থেকে বাধা দিবে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এবং নির্জনে ও জঙ্গলে অপরাধকে বাধা প্রদানকারী শুধুমাত্র একটি জিনিস, তা হলো আল্লাহর ভয়। এটা ছাড়া কোনো জিনিস বাধা প্রদান করতে পারে না। আর যখন এই ভয় অন্তর থেকে চলে যায়, তখন সামাজিক ব্যবস্থাপনায় অনেক খারাবিটা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমানে দেখো যে, অপরাধ নির্মূলের জন্য পুলিশের ওপর অন্য পুলিশ এবং এক আদালতের ওপর অন্য আদালত বানানো হয় এবং এক নিয়মের ওপর অন্য নিয়ম

বানানো হয়। কিন্তু ওই কানুন বর্তমানে দুই-চার পয়সায় বিক্রি হয়ে যায়। অথচ, আদালত নিজের জায়গায় কাজ করছে, পুলিশ নিজের জায়গায় কাজ করছে এবং ঘুষ বিরোধী আদালত কায়েম আছে, যাতে লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে এই অবস্থা হয়েছে যে, ঘুষের রেট বেড়ে যাচ্ছে এবং যে ঘুষ বিরোধী আদালত কায়েম হয়েছিল, সে নিজেই ঘুষ খাওয়ায় লিপ্ত আছে। কতদূর পর্যন্ত এই আদালত এবং বিভাগ সঠিক ভাবে কায়েম করতে থাকবে? এজন্যই প্রত্যেক কানুন এবং প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা ভেঙে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন কোনো ফর্মুলা আবিষ্কার হয়নি, যা অপরাধকে নির্মূল করতে পারে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতের ফিকির এমন এক জিনিস, যার মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল হতে পারে এবং জুলুম উঠে যেতে পারে।

শিক্ষণীয় ঘটনা - ০২

এক ব্যক্তি কুয়েতে চাকরি করত। ছুটিতে যখন সে করাচি এসেছে, তখন সে এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েছে। ট্যাক্সিতে নিজের সামানা রেখে নিজের ঘরে যাচ্ছে। পথিমধ্যে বাহাদুরাবাদের চৌরঙ্গী হয়ে পুলিশের একটি ঘোরসাওয়ার বাহিনী যাচ্ছিল। তখন সময় রাত তিনটা। ওই পুলিশ বাহিনী এই ট্যাক্সিকে আটকালো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোথেকে এসেছে? কোথায় যাচ্ছে? সে উত্তর দিলো যে, কুয়েত থেকে এসেছে এবং এখন এয়ারপোর্ট থেকে নিজের ঘরে যাচ্ছে। এরপরে জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি ওখান থেকে কি সামানা নিয়ে এসেছ? সে উত্তর দিল যে, যেই সামানা নিয়ে এসেছি এর যাচাই-বাছাই কাস্টম অফিসার করেছে। এর সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? অবশেষে একজন পুলিশ পিস্তল বের করে বলল যে, তোমার কাছে যা কিছু আছে সব বের করো এবং আমাদের কাছে দিয়ে দাও। কি আশ্চর্যের বিষয়! যে পুলিশ বন্দুক নিয়ে জনগনকে চোর এবং ডাকাত থেকে নিরাপত্তা দেবার জন্য ঘুরছিল, সেই বন্দুক তাক করে অন্যের মাল ছিনিয়ে নিয়েছে। যেই লোকে আইন সংরক্ষণ করবে এবং নিরাপত্তা দিবে, সে নিজেই নিরাপত্তা ভঙ্গ করেছে। এর কারণ শুধুমাত্র এটা যে, অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় চলে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি শেষ হয়ে গিয়েছে। মানুষ এটা ভুলে গিয়েছে যে, আমাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মরার পরে একদিন জীবিত হতে হবে। যার ফলে বর্তমানে খুন-খারাবি, রাহাজানি এবং পেরেশানি আমাদের ওপর চেপে বসেছে।

সাহাবায়ে কেলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমে তাকওয়া

এই ভয় ও অনুভূতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফল এই ছিল যে, যখন কোনো সাহাবি থেকে কোনো অপরাধ হয়ে যেত, তখন তিনি অস্থির হয়ে যেতেন যে, আমার থেকে এটা কি হয়ে গিয়েছে? তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ওপর শরীর শাস্তি আরোপ না করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা না চাইতেন এবং তাওবা না করতেন, ওই সময় পর্যন্ত তাঁর শাস্তি আসত না। সুতরাং অপরাধী নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের ওপর শাস্তি আরোপ করত এবং এটা বলত যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে কোনো পদ্ধতিতে পবিত্র করে দিন। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতের ফিকির না হবে এবং আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, ওই সময় পর্যন্ত দুনিয়া থেকে অপরাধ নির্মূল হতে পারে না। এটাকে শেষ করার জন্য চাই, যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করো না কেন?

শয়তান কিভাবে ধোঁকা দেয়

স্মরণ রাখবেন! এই অনুভূতি একবারে শেষ হয় না, বরং আস্তে আস্তে এই অনুভূতি যেতে থাকে। এর সুরত হলো যে, শয়তান মানুষকে গলদ রাস্তায় আনার জন্য একসঙ্গেই বড় কোনো গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে না। উদাহরণস্বরূপ, শয়তান প্রথমবারেই কোনো মানুষকে এটা বলে না যে, তুমি গিয়ে ডাকাতি করো। এ কারণে যে, ওই মানুষ তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করবে। ডাকাতি করা তো অনেক খারাপ জিনিস, আমি এটা করব না। বরং ওই শয়তান মানুষকে প্রথমে ছোট ছোট গুনাহে লিপ্ত করে। যেমন, তাকে বলে যে, খারাপ জায়গায় দৃষ্টি দাও, এতে আনন্দ পাবে। যখন আস্তে আস্তে এই ছোট গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তাকে বলে যে, যখন তুমি অমুক গুনাহ করেছিলে ওই সময়ে তোমার এই খেয়াল আসেনি যে, তোমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে যেতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে। যখন এই খেয়াল আসেনি, তাই এখন কেন এত ভাবছ? অতএব, দ্বিতীয় গুনাহও করে নাও। এরপরে তৃতীয় গুনাহ, চতুর্থ গুনাহর ওপর উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। যখন ছোট ছোট গুনাহের অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন

পরিশেষে শয়তান তাকে বলে যে, যখন এতগুলো গুনাহ করে নিয়েছ, তখন একটা বড় গুনাহ করতে সমস্যা কোথায়? এভাবে আস্তে আস্তে সে মানুষকে বড় থেকে বড় অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

ছোট গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তি বড় গুনাহ করে

বড় গুনাহ সর্বদা ছোট গুনাহের পরেই হয়ে থাকে। শয়তানের পক্ষ থেকে প্রথমে ছোট গুনাহ করার দুঃসাহস সৃষ্টি করা হয়। এরপর আস্তে আস্তে তাকে বড় গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বর্তমানে যুবকদের অন্তরে এই খেয়াল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে, আমাদেরকে সর্বদা এই দুনিয়ায় থাকতে হবে, কখনও এই দুনিয়া থেকে যাব না। কেননা, গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাব দেওয়ার অনুভূতি অন্তর থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন বড় থেকে বড় গুনাহ করার জন্য রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। দরজার চৌকাঠ খুলে গিয়েছে। এখন যে গুনাহ করতে মন চায়, তা করে নাও। আরবি ভাষায় একটা বক্তব্য আছে—

الشر يبداه في الاصل اصغره

অর্থাৎ, বড় গুনাহের শুরুটা সর্বদা ছোট গুনাহ থেকেই হয়ে থাকে এবং সামান্য ফুলিঙ্গের আশুনের ফুলকি থাকে।

এজন্য কখনও কোনো গুনাহকে ছোট মনে করে গ্রহণ না করা যে, চলো! এটা ছোট গুনাহ, তাই করে নেই। এ কারণে যে, হয়তো এটা শয়তানের চক্রান্ত যে, সে আমাদের তার জালে ফাঁসানোর জন্য এবং তার কন্ট্রোল আমাদের ওপর হাসিল করার জন্য এবং আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতের ফিকির মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছে। এ কারণে, গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তা ছেড়ে দেওয়া।

এটা সগিরা গুনাহ নাকি কবিরা গুনাহ

হজরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, লোকেরা অনেক আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক গুনাহ সগিরা নাকি কবিরা? জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, যদি কবিরা গুনাহ হয় তাহলে ওটা করতে সামান্য ভয় পাবে। হজরত বলেন যে, সগিরা এবং কবিরা গুনাহের উদাহরণ এমন, যেমন এক স্কুলিঙ্গ এবং একটা বড় আগুন। কখনও আপনি তাকে দেখেছেন যে, ছোট একটা স্কুলিঙ্গকে কেউ সিন্দুকে রেখে দিয়েছে এবং এটা মনে করেছে যে, একটা ছোট স্কুলিঙ্গ। কোনো জ্ঞানী মানুষ এটা করবে না। কেননা, সিন্দুকে রাখার পরে তা আগুন হয়ে যাবে এবং সিন্দুকের মধ্যে যতগুলো জিনিস থাকবে ওই সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিবে এবং সিন্দুককেও জ্বালিয়ে দিবে। হতে পারে যে, সে পুরো ঘর জ্বালিয়ে দিবে। গুনাহের অবস্থা এমনই। গুনাহ ছোট হোক অথবা বড় হোক, সেটা আগুনের স্কুলিঙ্গ। যদি তোমরা নিজেদের ইচ্ছায় একটা গুনাহ করো, তাহলে হতে পারে যে, ওই একটা গুনাহ তোমাদের পুরো জীবনের পুঁজিকে জ্বালিয়ে দিবে। এ কারণে এই ফিকির করো না যে, ছোট নাকি বড়? বরং এটা দেখো যে, গুনাহ নাকি গুনাহ নয়? এই কাজ নাজায়েজ কিনা? আল্লাহ তাআলা এটা থেকে নিষেধ করেছেন কিনা? যখন এটা জানা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা এটা থেকে নিষেধ করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার সামনে জবাব দেওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে এটা চিন্তাও করো যে, এই গুনাহ করে আমি আল্লাহ তাআলাকে কিভাবে মুখ দেখাব? মোটকথা, এই আয়াতের মিসদাক হওয়ার পদ্ধতি হলো যে, যখনই মানুষের অন্তরে গুনাহের আগ্রহ জাগবে, তখন ওই সময় আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর ধ্যান করবে এবং এর মাধ্যমে গুনাহকে ছেড়ে দিবে।

গুনাহের আগ্রহ জাগার সময় এই কল্পনা করো

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার কল্পনা করতে চায়, তাহলে অনেক সময় আল্লাহ তাআলার ধ্যান এবং তাঁর কল্পনা আসে না। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলাকে সে কখনও দেখেনি। কল্পনা তো ওই জিনিসের হতে পারে, মানুষ যাকে দেখেছে। এজন্য আল্লাহ তাআলার কল্পনা এবং তাঁর ধ্যান করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন গুনাহের আগ্রহ জাগবে,

তখন একটা জিনিসের কল্পনা এবং ধ্যান করে নাও। তা হলো এই যে, আমি যে গুনাহ করার ইচ্ছা করেছি, যদি ওই গুনাহ করার সময় আমার বাবা দেখে অথবা আমার সন্তান দেখে অথবা আমার ওস্তাদ দেখে অথবা আমার শায়েখ দেখে অথবা আমার বন্ধু-বান্ধব দেখে, তাহলে ওই সময়ও কি আমি এই গুনাহ করব? উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টি খারাপ জায়গায় দিতে মন চাইতেছে, ওই সময় এই চিন্তা করো যে, যদি ওই সময় তোমার শায়েখ তোমাকে দেখে অথবা তোমার বাবা তোমাকে দেখে অথবা তোমার সন্তান তোমাকে দেখে, তাহলে ওই সময়ও কি তোমার দৃষ্টি গলদ জায়গায় ফেলবে। সুস্পষ্ট কথা যে, তখন দৃষ্টি উঠবে না। এ কারণে যে, এটা একটা ভয় যে, যদি ওই সমস্ত লোকদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি আমাকে এই অবস্থায় দেখে, তাহলে এই লোকেরা আমাকে খারাপ মনে করবে। অতএব, যখন এই সাধারণ দরজার মাখলুকের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে, নিজের আগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করলে এবং দৃষ্টি সরিয়ে ফেললে, তখন প্রত্যেক গুনাহ করার সময় এই কল্পনা করো যে, আল্লাহ তাআলা যিনি সকলের মালিক এবং এই সকল ব্যক্তিদের স্রষ্টা এবং মালিক, তিনি আমাকে দেখছেন। এই কল্পনার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ অন্তরে একটা বাধা সৃষ্টি হবে।

যৌবনে ভয় এবং বার্ষিক্যে আশা

একজন মুমিনের কাজ হলো যে, সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে আশাও রাখবে। কিন্তু বুজুর্গরা বলেছেন যে, যৌবনে যদি ভয় বেশি থাকে, তাহলে এটা বেশি ভালো। কেননা, যৌবনে যখন মানুষের হাত, পা ভালোভাবে চালাতে পারে, শক্তি-সামর্থ্য থাকে এবং মানুষ সর্বপ্রকার কাজ করতে পারে, তখন ওই সময় গুনাহের আগ্রহ অন্তরে বেশি সৃষ্টি হয় এবং গুনাহের কাজও বেশি হতে থাকে এবং গুনাহের তাকাজা বেশি হয়, ওই সময় তার অন্তরে আল্লাহর ভয় বেশি থাকা বেশি উপকারী হয়। যাতে ওই ভয় মানুষকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তবে যখন মানুষ বার্ষিক্যকে পৌঁছাবে এবং শেষ বয়সে উপনীত হবে, ওই সময় আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা তার অন্তরে বেশি থাকা চাই। যাতে সে নিরাশ না হয়ে যায়।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার ভিত্তি ভয়ের ওপর

বর্তমানে মানুষ এটা মনে করে যে, 'আল্লাহর ভয়' অর্জন করার মতো কোনো জিনিস নয়। অতএব, কিছু লোক এটা বলে যে, আল্লাহ তাআলা তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং কুরআনুল কারিমে বারবার বলেছেন যে, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু তাহলে এরপরেও কেন তাঁকে ভয় পেতে হবে? এবং ডরাতে হবে? স্পষ্ট কথা যে, যখন এই চিন্তা হবে, তখন এরপরে আল্লাহর ভয় অর্জন করার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি কিভাবে হবে? এরই ফল হলো যে, বর্তমানে লোকেরা গাফলতের গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে জীবনযাপন করছে। স্মরণ রাখো যে, এই ভয় এমন এক জিনিস, যদি এটা না থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোনো কাজ, কোনো লেনদেন চলতে পারে না। যদি ছাত্রদের পরীক্ষায় ফেল করার আশঙ্কা ও ভয় না থাকে, তাহলে সে কখনও মেহনত করবে না। এই ভয়েই তার মাধ্যমে মেহনত করাচ্ছে এবং তাকে পড়াচ্ছে। যদি কোনো ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়ার ভয় না থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব পালন করবে না; বরং শুধু বসে সময় নষ্ট করবে এবং কাজ করার কষ্ট ও মুসিবত গ্রহণ করবে না।

সন্তানের যদি পিতার ভয় না থাকে, অধীন ব্যক্তিদের অফিসারের ভয় না থাকে, সাধারণ ব্যক্তিদের প্রশাসনের ভয় না থাকে, তাহলে এর ফল হলো, নিয়ম-নীতি ও ব্যবস্থাপনা না থাকা। তখন নৈরাজ্য ও নিপীড়ন শুরু হয়ে যাবে। এর ফলে কোনো মানুষের হক সংরক্ষণ থাকতে পারে না। বর্তমানে যে নিরাপত্তাহীনতা এবং অশান্তির তুফান দেখা যাচ্ছে যে, কারও জানের নিরাপত্তা নেই, কারও মালের নিরাপত্তা নেই, কারও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। ডাকাতি হচ্ছে, চুরি শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে মানুষ, মশা মাছি থেকেও বেশি অগ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে। এর কারণ হলো যে, একদিকে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় বেরিয়ে গিয়েছে এবং প্রশাসনের ভয় উঠে গিয়েছে। বর্তমানে দুই-চার পয়সার কারণে নিয়ম-নীতি ভেঙে যাচ্ছে। সুতরাং টাকা পয়সা খরচ করো এবং কানুন থেকে বাঁচো। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, পুরো সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন

মোটকথা, এই ভয় এমন এক জিনিস যে, এর ওপর সমস্ত বিশ্বব্যবস্থা ঠিক আছে। যদি ভয় না থাকে, তাহলে নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি এবং নিয়ম-নীতি ভঙ্গ হতে থাকবে। এ কারণে কুরআনুল কারিমে বারবার বলা হয়েছে যে, اتقوا الله اتقوا الله তাকওয়া অর্জন করো। তাকওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলার ভয়ে অপরাধ থেকে বেঁচে থাক। যেভাবে দুনিয়ার শাসনব্যবস্থা ভয় ছাড়া চলতে পারে না, অনুরূপভাবে দ্বীনের ভিত্তিও আল্লাহ তাআলার ভয়ের ওপর। আল্লাহ না করুন, যদি এই ভয় অন্তর থেকে শেষ হয়ে যায় অথবা এতে কমতি এসে যায়, তাহলে গুনাহ বেড়ে যাবে। যেমন বর্তমানে আমরা এটা স্বচক্ষে দেখছি। কুরআনুল কারিমে অনেক জায়গায় জাহান্নামের আলোচনা হয়েছে। কোথাও জাহান্নাম এবং তার শাস্তির আলোচনা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং তার কুদরতের আলোচনা হয়েছে। যাতে করে প্রত্যেক মুসলমান এই বিষয়টিকে বারবার চিন্তা করে এবং এই ধ্যান করে এবং এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি করে।

নির্জনতায় আল্লাহ তাআলার ভয়

পুলিশের ভয়, প্রশাসনের ভয়, শাস্তির ভয় অথবা জেলের ভয় এমন এক জিনিস, যা শুধুমাত্র অন্য মানুষের সামনে অপরাধ করা থেকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে থাকবে, তখন এরপরে জঙ্গলের নির্জনতায় এবং রাতের অন্ধকারেও ওই ভয় মানুষকে গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করে। যখন অন্য কেউ না দেখে। মনে করুন যে, রাতের অন্ধকার, জঙ্গলের নির্জনতা এবং কেউ দেখছেও না, ওই সময় মুমিন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া অন্য এমন কোনো জিনিস আছে কি, যা তাকে গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করছে? আল্লাহ তাআলার ভয়ই তাকে এই গুনাহ থেকে বিরত রাখছে।

সর্বক্ষেত্রে এই ভয় সৃষ্টি করো

যদি দৃষ্টির খুব আগ্রহ হয় যে, সে গলদ জায়গায় তাকাবে, তাহলে আল্লাহ তাআলার ভয়ে এই কঠিন আগ্রহকে দাবিয়ে রাখো। দৃষ্টি দিয়ো না। এভাবে গিবত করা, মিথ্যা বলার খুব আগ্রহ হয়েছে, তখন যেভাবে রোজা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ভয়ে পানি পান করা থেকে বিরত রয়েছিলে, অনুরূপভাবে এখানেও গিবত এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার ভয়। যখন এই ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন মানুষ যেকোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খেলাফ কাজ করতে পারে না। এই ভয়ই শরিয়তের আসল উদ্দেশ্য।

মারেফাত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার ভয়

ভয়ের ব্যাপারে উসূল হলো, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মারেফাত যত বেশি হবে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়ও তত বেশি হবে। আর যত বেশি আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হবে, তার ভয়ও তত কম হবে। দেখুন! একজন ছোট বাচ্চা, যে এখনো কিছু বুঝে না। তার সামনে যদি কোনো বাদশা এসে যায়, কোনো উজির আসে অথবা কোনো বাঘ আসে, তাহলে সেটাকে ভয় পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাদশাহের মর্যাদা সম্পর্কে জানে, সে বাদশার কাছে কাঁপতে কাঁপতে যায়। হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের মারেফাত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পরে সবচেয়ে বেশি ছিল। এ কারণে তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় বেশি ছিল।

হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভয়

একবার হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু পেরেশান হয়ে, ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন যে—

نافق حنظلة يا رسول الله

ইয়া রাসুলুল্লাহ, হানজালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিভাবে মুনাফিক হলে? হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যখন আমি আপনার মজলিসে বসি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনি, আখিরাতের আলোচনা শুনি, তখন এর ফলে আমার অন্তর নরম হয়ে যায়, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয়, দুনিয়া থেকে বিমুখতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আখিরাতের ফিকির সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন আমি ঘরে যাই, বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে ওঠাবসা করি, লেনদেন করি এবং বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত হই, তখন অন্তরের এই অবস্থা থাকে না। বরং দুনিয়ার মুহাব্বত আমার অন্তরে চেপে বসে। অতএব, এখানে এক অবস্থা এবং বাহিরে গিয়ে অন্য অবস্থা। এটা তো মুনাফিকদের আলামত। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

يا حنظلة ساعة وساعة

হে হানজালা, ঘাবড়ানোর এটা বিষয় নয়। এটা তো সময়ে সময়ে পরিবর্তন হওয়ার বিষয়।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯৩৭, সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪৩৮, ইবনু মাজা, হাদিস নম্বর : ৪২২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ১৬৯৪৯]

কোনো সময় অন্তর বেশি নরম থাকবে, কখনও কম থাকবে। আল্লাহ তাআলার এখানে এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং আসল ভিত্তি হলো আমলের ওপর যে, মানুষের কোনো আমল শরিয়তের পরিপন্থি না হোক।

হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ভয়

হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী শুনেছিলেন যে-

عمر في الجنة

ওমর জান্নাতে যাবে।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নম্বর : ৩৬৮০, আবু দাউদ, হাদিস নম্বর : ৪০৩১, ইবনু মাজা, হাদিস নম্বর : ১৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর : ১৫৪৩]

এবং এই ঘটনাও শুনেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আমি মেরাজে গিয়েছিলাম এবং সেখানে জান্নাতের সফর করেছি, তখন জান্নাতের মধ্যে আমি একটা সুন্দর মহল দেখেছি। ওই মহলের কিনারায় একজন নারী বসে অঙ্গু করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার মহল? আমাকে বলা হয়েছে, এটা ওমরের মহল। ওই মহল এত সুন্দর ছিল যে, আমার অন্তর চেয়েছিল যে, ভেতরে গিয়ে ওই মহলকে দেখব। কিন্তু হে ওমর, তোমার আত্মমর্যাদাবোধের বিষয় আমার স্মরণে এসে গেল যে, তুমি অনেক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। এ কারণে আমি ওই মহলের ভেতর ঢুকিনি। বরং ফিরে এসেছি। যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা

শুনলেন, তখন তিনি ক্রন্দন করে দিলেন এবং বললেন—

او عليك يا رسول الله اغار

ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি কি আপনার সঙ্গেও আত্মমর্যাদা দেখাব?

[সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৩৪০৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর : ৪৪০৮, ইবনু মাজা, হাদিস নম্বর : ১০৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর : ৮১১৫]

দেখুন! হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান মোবারক থেকে নিজের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শুনেছিলেন এবং জান্নাতে নিজের মহল সম্পর্কে শুনেছেন। তা সত্ত্বেও তার এই অবস্থা ছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে তিনি হজরত হুজাইফা ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসতেন, যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের তালিকা বলে দিয়েছেন যে, মদিনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমার নাম আছে কিনা? [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড-৫]

তাঁর এই খেয়াল এসেছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরকম হয়ে গেল কিনা যে, আমার পরবর্তী আমলের কারণে ওই সুসংবাদ নষ্ট হয়ে গেল। দেখুন! হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আশঙ্কায় থাকতেন। মোটকথা, যে ব্যক্তির যত মারেফাত অর্জন হয়, ওই ব্যক্তির হৃদয়ে তত বেশি ভয় সৃষ্টি হয়। এই ভয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো উপায়ে অর্জন না হবে, ওই সময় পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন হতে পারে না।

ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি

এই ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি হলো যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্য থেকে কিছু সময় ফজরের পরে বা রাতে ঘুমের সময় নির্ধারণ করে নিবে। এরপরে ওই সময় এই বিষয়ের কল্পনা করবে যে, আমি মৃত্যুবরণ করছি, মৃত শয্যায় শায়িত আছি, নিকটাত্মীয় এবং আত্মীয়-স্বজনেরা একত্রিত হয়েছে, আমার রুহ বের হচ্ছে, এরপরে আমাকে কাফন পরানো হচ্ছে, কাফন পরানোর পরে দাফন দেওয়া হচ্ছে, এরপরে ফেরেস্তারা প্রশ্ন-উত্তরের জন্য এসেছে, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে পেশ করা হচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়ের ধ্যান করে চিন্তা-ভাবনা করবে। যখন মানুষ প্রতিদিন এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ অন্তর থেকে আস্তে আস্তে উদাসীনতার পর্দা যেতে শুরু করবে। আমাদের ওপর গাফলত এজন্য চেপে বসেছে যে, আমরা মৃত্যু থেকে উদাসীন। আমরা নিজ হাতে নিজেদের প্রিয় ব্যক্তিদেরকে মাটিচাপা দিই, নিজেদের কাঁধে জানাজা বহন করি, নিজের চোখে দেখি যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। স্বচক্ষে দেখি, যে দুনিয়াকে জমা করেছিল এবং তাকে অর্জন করার জন্য সকাল সন্ধ্যা দৌড়-ঝাপ দিয়েছিল, মেহনত এবং কষ্ট সহ্য করেছিল, কিন্তু যখন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, তখন ওই সময় তার দিকে কেউ মুখ ফিরিয়ে দেখে না। এই সমস্ত জিনিস দেখা সত্ত্বেও আমরা এটা মনে করি যে, এই মৃত্যুর ঘটনা তার সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। নিজের দিকে ধ্যান আসে না যে, আমারও একদিন এভাবে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। এজন্য নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে-

اكثرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللّٰذَاتِ الْمَوْتِ

এই জিনিসকে বেশি বেশি স্মরণ করো যে, যা এই সমস্ত স্বাদকে খতম করে দেয়।
[সুনানে তিরমিজি- হাদিস নাম্বার: ২২২৯, সুনানে নাসাই- হাদিস নাম্বার: ১৮০১]

অর্থাৎ, এটাকে ভুলে যেয়ো না। বরং এটাকে বেশি বেশি স্মরণ করো। মোটকথা, দৈনিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ সমস্ত বিষয়ের সামান্য কল্পনা করো, মুরাকাবা করো, তাহলে এর মাধ্যমে কাক্ষিত ভয়ের কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই অর্জন হবে।

কিছু বাস্তব কথা

এখন আমরা প্রায় সবাই সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রীক। আমরা এইখানে কেউ কাউকে চিনি না ভালোভাবে। তাদের কাউকে অশালীন ভাষায় কথা বলতে দেখি, খারাপ কমেন্ট করতে দেখি, কিন্তু যদি তাদের মাঝে তাকওয়া থাকত তবে তারা এমন করতে পারত না। তাদের আখলাক হইত সুন্দর। আল্লাহকে ভয় করলে তারা কখনোই কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারত না। সময় নষ্ট করত না এইসব কাজ করে। মুত্তাকীদের প্রতিটি সেকেন্ড অনেক মূল্যবান। তারা অযথা কাজে তাদের সময় গুলা অপচয় করে নাহ।

আবার আমাদের বেশির ভাগ কাজ, পড়াশুনা এখন অনলাইন এই। আগে এতো অনলাইন এর প্রচলন ছিল না। অফলাইন এই সব পড়াশুনা, কাজ করতে হইত। এখন অনেক অনলাইন কোর্স করি আমরা। সেখানে পরিক্ষা গুলাও হয় অনলাইন ভিত্তিক। এইখানে চাইলেই অনেকেই নোট দেখে দেখে পরিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সেখান থেকে দূরে সরে আসাই তাকওয়া। অনলাইনে পরিক্ষা দেয়াটা তাকওয়া অবলম্বন এর একটা বড় উদাহরণ। এইখানে নিজেই নিজের শিক্ষক। কেউ তাকে দেখছে না। কিন্তু তার অন্তরে এই ভয় আছে যে তার আল্লাহ তাকে দেখছেন। তাই সে সেখান থেকে দূরে থাকে।

আজকে এতো অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অপহরণ, ধর্ষণ, জুলুম হবার একটাই কারণ। তা হচ্ছে অন্তরে তাকওয়া না থাকা।

আজকে সংসার গুলাতে অশান্তি, জেনা, পরোকিয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ এই সব কিছু হওয়ার একটাই কারণ, তাদের হৃদয়ে তাকওয়া বিদ্যমান না থাকা।

আমরা কি আল্লাহকে ভয় করি নাকি মানুষকে ভয় করি? প্রশ্নটা কেমন হইলেও বাস্তবতা এমনই। আমরা যদি দেরি করে ঘুমাই তাইলে ভোরে ফজরের নামাযে উঠতে পারি না, কিন্তু এই আমরাই কখনো কখনো দেরি করে ঘুমিয়ে বা না ঘুমিয়েও ঠিক ৩টা বা ৪টায় উঠে পিকনিক যেতে পারি, ভোরে ঘুমের কারণে ফজর মিস হয় কিন্তু অফিস মিস হয় না। অফিসে দেরি করে গেলে বসের বকা খেতে হবে এই ভয়ে আমরা ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারি, কিন্তু ফজর মিস হয়ে গেলে যে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে তা আমাদের গায়েই লাগে না। আল্লাহর ভয়ে যে আমরা ফজরে উঠব এই মানোসিকতা আমাদের থাকে না। ফজর মিস হইলেও এতোটা আফসোস থাকে না যতটা অফিসে দেরি করে গেলে হয়। কথা গুলা তিক্ত হইলেও সত্য। তাহলে বিবেচনা করলে দেখা যায় আমরা আসলে রব কে না মানুষকেই বেশি ভয় পাই। কিন্তু উচিত ছিল রবকেই বেশি ভয় করা।

আবার আমরা আমাদের কাজের কারণে সলাত দেরি করে পড়ি বা কাযা করি। আর বলি যে, কাজের কারণে নামাজ পড়তে পারি নাই। অথচ উচিত ছিল সব কাজ ফেলে আগে সলাত আদায় করা। আল্লাহ ভীতি থাকলে সব কাজ ফেলে আগে সলাত ই প্রাধান্য পেত বেশি। আমরা এমন যে, কাজের কারণে সলাত ছেড়ে দেই। কিন্তু সলাতের কারণে কাজের গাফেলতি করি নাই। কি ভয়াবহ অবস্থা আমাদের!

আরো তিক্ত সত্যি কথা এইটা যে, আমরা এখন এমন যে আল্লাহর থেকে সিসিটিভিকে বেশি ভয় পাই। রুমে একা থাকা অবস্থায় সিসিটিভি থাকলে যে গুনাহ করতাম না, সেই গুনাহ সিসিটিভি না থাকলে অনায়াসে করে ফেলি। এই টুকু লজ্জাবোধ কাজ করে না আমাদের মাঝে যে, রুমে সিসিটিভি না থাকুক রুমের মাঝে আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমি কিভাবে এই গুনাহ করতে পারি? আমি যেখানে যে প্রান্তে যেভাবেই থাকি না কেন? সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকিলেও আল্লাহ আমাকে দেখবে। কিন্তু এই ভয় আমাদের মাঝে থাকে না। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি অন্তরে জাগে না।

আপনি কোনো মানুষকে সুদ খেতে বা ঘুষ নিতে/নিতে দেখছেন, সাথে সাথে তাকে আলাদা ভাবে বলুন যে, আপনি তো মুসলিম। আল্লাহর সামনে একদিন উপস্থিত হইতে হবে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করুন। তাকে সুদ-ঘুষের ভয়াবহতা ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত করুন।

জেনাকারী ভাই-বোনদের তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রচুর নসিহা করতে হবে। তাদের পরিবারকে বুঝিয়ে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাকওয়া না থাকার কারণে তারা যে গুনাহ করছে তা সামাজিক অবক্ষয় কারণ। সেগুলো বুঝাইতে হবে।

নিজেদেরকে নিয়ে, নিজের পরিবার, সমাজ নিয়ে চিন্তা ফিকির করা উচিত। আমরা আসলে করছি কি আর আমাদের করতে বলা হয়েছে কি? আমাদের মাঝে তাকওয়া কতটুকু??

অধ্যায়- ১১ : মানবজীবনে তাকওয়া

মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ তাকওয়া। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তিও হচ্ছে এটি। মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মূলত তাকওয়া অবলম্বন জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ -এর হাদীসে আছে,

দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না, একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

বস্তুত তাকওয়া সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমাজে একে অপরের মাঝে ইতিবাচক মূল্যবোধ গঠন করে অন্যদিকে তাকওয়ার অভাবে মানুষ চারিত্রিক পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে,

যার নজীর বর্তমান বিশ্বের কোথাও-কোথাও বিরাজমান। সুতরাং মানব জীবনকে মানবতার কল্যাণে তথা সকল সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত করনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য একান্তই অপরিহার্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তাকওয়া

আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা বিদ্যমান যে যারা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক, খানকা বা মাজারের খাদেম, পীর সাহেব, যারা লম্বা জুব্বা পরেন, যাদের লম্বা দাড়ি আছে, যারা লম্বা পাগড়ী পরেন, যারা কালো বোরকা পরেন, যারা নিকাব করেন প্রমুখ ব্যক্তিগণই তাকওয়াবান এবং তাকওয়ার বিষয়টি শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, উকিল, ব্যারিস্টার, আর্মি অফিসার, থানার ওসি, ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা, বাদাম ওয়ালা, কৃষক, কন্ট্রাকটর, রাজনীতিবিদ, চেয়ারম্যান, এমপি, মিনিষ্টার, দেশের প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি প্রফেশনের লোকদের জন্যে তাকওয়া নয়।

আসলে তাকওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ইলম এবং আমলের উপর। ইসলামের পরিভাষায় পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যার ভেতর দ্বীন ইসলামের জ্ঞান আছে এবং সেই অনুযায়ী যিনি আমল করেন তিনিই তাকওয়াবান। এখন একজন ইঞ্জিনিয়র বা একজন ডাক্তার বা একজন পাইলট বা একজন ব্যাংক ম্যানেজার বা একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা একজন ব্যারিস্টার বা একজন এমপি বা একজন মিনিষ্টার বা একজন থানার ওসি বা একজন বাস ড্রাইভারের মধ্যেও দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকতে পারে এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি সে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করে থাকেন তাহলেই বাস্তবে তার তাকওয়ার প্রমাণ মিলবে।

আমরা জানি কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। উদাহরণস্বরূপ এই পৃথিবীতে যতো জিনিস তৈরী হচ্ছে, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, গাড়ি, প্লেন, ট্রেন, সেলফোন ইত্যাদি বাজারজাত করার সময় কোম্পানী পণ্যের সাথে একটা করে

অপারেটিং ম্যানিউয়্যালও দিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি, আল্লাহ যখন মানুষকে তৈরী করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখনও একটা ম্যানিউয়্যাল সাথে দিয়ে দিয়েছেন, যার ভেতরে আছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে পরিচালনা করব এসব নিয়মাবলীর সেই ম্যানিউয়্যাল হচ্ছে আল কুরআন। এরপর মহান আল্লাহ এতই দয়ালু যে তিনি শুধু ম্যানিউয়্যাল পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আবার সাথে একজন ট্রেনারও পাঠিয়েছেন যিনি ঐ ম্যানিউয়্যালটা তার বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেই ট্রেনার হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। রাসূল (সা:) পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতীর সকল সমস্যার সমাধান। যেমন: ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসানীতি, ধর্মনীতি, আইননীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এসেছেই দুনিয়াকে চালানোর জন্য।

একটা সাধারণ বিষয় হচ্ছে যারা বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত যেমন : ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, ব্যারিষ্টার, এমপি, মিনিষ্টার, থানার ওসি, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর পড়াশোনা করে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে এই সমাজ এবং দেশকে পরিচালনা করেন তাহলেই কুরআনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। আর যারা কুরআন-হাদীস পড়ছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে কে এই সমাজ বা দেশকে কুরআনের আলোকে পরিবর্তন করবে? যেমন, যিনি ফিনান্স বা ইকোনমিক - এ পড়াশোনা করেছেন বা এম.বি.এ করেছেন তিনি যাকাত বা ইসলামিক ব্যাংকিং ভাল বুঝবেন। তাই আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে থাকবে একাডেমিক পড়াশুনা এবং ইসলামিক পড়াশুনা এর মিশ্রণ।

সত্যিকার চিত্রটা হওয়ার কথা ছিল এমন যে, যখন মাগরিবের আজান হবে ডিউটিরত থানার ওসি সকল পুলিশদের সাথে নিয়ে জামাতে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ইমামতি করবেন ওসি সাহেব নিজে, সলাত আদায় শেষে ১০/১৫ মিনিট কুরআন হাদীস থেকে ওসি সাহেব সিপাহীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষামূলক দিকনির্দেশনা নসিহত করবেন। একইভাবে যখন যোহরের আজান হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের

মন্ত্রীসাহেবগণ তার নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের সকলকে নিয়ে জামাতে নামাযের ইমামতি করবেন এবং মন্ত্রণালয় চালাবেন তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। আবার একইভাবে যোহর-আসর নামাযের আজান হলে ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলরের ইমামতিতে সকল ছাত্র- ছাত্রীরা জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। জেলখানার জেলার সাহেব ডিউটিরত পুলিশ এবং সকল কয়েদীদের নিয়ে জামাতে সলাত তো আদায় করবেনই তার পাশাপাশি সাপ্তাহিক ইসলামী মাহফিল ও তাদেরকে নিয়ে জামাতে তাহাজ্জুদ এর সলাত আদায় করবেন। এভাবে যার যার এলাকার এমপি সাহেব জুম্মার সলাতের খুতবা দিবেন এবং ইমামতি করবেন। ঈদের সবচেয়ে বড় জামাতের ইমামতি করবেন রাষ্ট্রপতি নিজে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাকওয়া ভিত্তিক দেশ গঠনের জন্য খুতবা দিবেন। হ্যাঁ, কুরআন বলে যে, মুসলিমগণের মাঝে যারা সমাজ পরিচালনা করবেন বা দেশ পরিচালনা করবেন অথবা কোন নেতৃস্থানীয় স্থানে থাকবেন, তাদের অবশ্যই কুরআনের উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে। আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন কুরআন- হাদীস নিয়ে শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের, অন্যদের নয়। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক আমিন।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় ও তাকওয়া

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে তাকওয়ার ভিত্তিতে বিশেষ কতগুলো গুণের উপস্থিতিও ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এরশাদ করেছেন:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

“আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সিয়ামদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক আল্লাহ তা'আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুই ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার কোন মু'মিনের নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।” - (সূরা আহযাব, ৩৫-৩৬)

হে মুসলিম জনতা ! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্যে হালাল করে নিয়েছো। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

وَبُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা বাকারাহ- ২২৮)

মহানবী (সা:) বলেন, মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াত্তের সলাত আদায় করে, রমাদানের সিয়াম পালন করে, নিজের ইজ্জতের হিফায়ত করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। (আহমাদ)

তবে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে, হারাম বিষয়ে নয়। স্বামী পর্দা করতে নিষেধ করলে, সলাত-সিয়াম করতে নিষেধ করলে, তা মানা যাবে না। যেহেতু 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।' (আহমাদ)

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা:) বলেছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশীরভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন : 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভাল ব্যবহার পাইনি।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

স্বামীকে না মানলে স্ত্রীর সলাত কবুল হয় না। মহানবী (সা:) বলেন, 'তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, [যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে], [অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত] এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।' (তিরমিযী, ত্বাবারানী)

রাসুল (সা:) আরো বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে [স্বামী] তার প্রতি নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেস্তাগণ তাকে [স্ত্রীকে] সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সন্তান প্রতিপালনে তাকওয়া

সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।”

আবার সূরা আত- তাগাবুন এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার"।

সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা কত কিছুই না করছি। আর সেই সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে “মুসলিম” না হয় তাহলে আমাদেরকে আখিরাতের ময়দানে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। এবং এই সন্তানই ঐদিন তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। তাই আমরা যেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একদিক চিন্তা না করি।

পিতামাতারা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে এর জন্যে একদিন চরম মাসুল দিতে হবে। যদি মনে করি যে ভাল স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আমি চিন্তামুক্ত, এখন কেবল সন্তানের ভাল রেজাল্ট আর ভাল চাকুরীর অপেক্ষা, আর এভাবেই আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হবেন। এভাবে একদিক চিন্তা করলে আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ স্কুল, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি নৈতিকতা শেখানো হয় যা ইসলামের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমাদের প্রজেক্ট হবে সন্তানদের তাকওয়ার ভিত্তির উপর একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার

পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

মাতা-পিতার অধিকার ও তাকওয়া

ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাতা-পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সন্তানের। বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তারা খুবই অসহায় হয়ে পড়েন,

তারা সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অনেক সন্তানই এই বিষয়টা বুঝেন না। তারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাড়তি বোঝা মনে করেন। নিজেদের ব্যস্ততা নিয়ে নিজেদের মতো সময় কাটান কিন্তু বাবা-মাকে সময় দেন না যা খুবই কষ্টকর। মনে রাখতে হবে মাতা-পিতা যদি কষ্টে জীবনযাপন করেন তাহলে সন্তানকে এজন্য আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। তাই মা-বাবার সাথে সবসময় তাকওয়ার ভিত্তিতে উত্তম ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে দেখাশোনা করতে হবে।

ছোট ভাইবোনদের প্রতি বড় ভাইয়ের অবহেলা

বাবা মারা গেলে অথবা বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেলে অথবা বাবা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে গেলে বড় ভাইয়ের দায়িত্ব ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা। এই দায়িত্ব হতে হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজন মিটানো বড় ভাইয়ের দায়িত্ব। অতি দুঃখের বিষয় যে, বাস্তবে আমাদের সমাজে দেখা যায় যে বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক বড় ভাই-ই ছোট ভাইবোনদের ঠিক মতো দেখেন না। তাদেরকে অবহেলা করেন, তাদেরকে বোঝা মনে করেন। আর বড় ভাই যদি বিবাহিত হন তাহলে তো অবস্থা আরো করুণ আকার ধারণ করে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা যে কত বড় অন্যায় তা বড় ভাইয়েরা জানেন না। এই ছোট ভাইবোনরা যদি ঠিক মতো মানুষ না হয় তাহলে তার জন্য বড় ভাইকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। আমাদের সমাজে আবার কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন বড় ভাই তার ছোট ভাইবোনদের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন, তাদেরকে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বিনি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলেন।

অন্যান্যদের অধিকার ও তাকওয়া

অন্যান্যদের অধিকারের মধ্যে আরো রয়েছে প্রতিবেশীর অধিকার এবং আত্মীয়ের অধিকার। প্রতিবেশীর অধিকার এবং আত্মীয়ের অধিকার নিয়ে কুরআন এবং হাদীসে অনেক জায়গায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া রয়েছে শ্রমিকের অধিকার যেমন রিক্সাওয়ালা, গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার, যারা ইট ভাঙেন তাদের অধিকার, বাসার দাড়োয়ানের অধিকার, মালির অধিকার ইত্যাদি। সবার ক্ষেত্রেই

তাকওয়া অবলম্বন করার কথা। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেক গার্মেন্টস মালিক পক্ষই তাদের শ্রমিকদের ঠকিয়ে থাকেন, অনেক কন্ট্রাকটররাই ইট ভাঙার পর ঠিকমতো শ্রমিককে মুজুরী দেন না, অনেক সাহেবরাই তাদের বাড়ির দাড়োয়ান বা মালিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন না, বরং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। অথচ এদের পরিশ্রমের মাধ্যমেই একটি শ্রেণী বড়লোক থেকে আরো বড়লোক হচ্ছে।

কাজের বুয়ার অধিকার ও তাকওয়া

বিভিন্ন মানুষের অধিকারের মধ্যে কাজের বুয়া বা কাজের লোকের অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি রয়েছে দারওয়ান, ড্রাইভার এবং মালির অধিকার। যেমন কাজের বুয়ার অধিকার আদায়ের জন্য সিংগাপুর সরকার আইন করে দিয়েছে। কোন মালিক যদি নিজ বাসায় কাজের বুয়া রাখতে চায় তাহলে তাকে আগে একটি সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে কাজের বুয়ার সমস্ত অধিকার। এই নিয়ম একটি অমুসলিম দেশের সরকার বাস্তবায়ন করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক মুসলিম দেশেও এই আইন নেই। কাজের বুয়ার অধিকারগুলো ১৪শত বছর আগেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন যা আমরা মুসলিমরা মান্য করি না বরং তাদেরকে নির্যাতন করি।

আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে তাকওয়া

প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্যগ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্বও অত্যাধিক। ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে।

ব্যবসা করার ক্ষেত্রে মাফে কম দেয়া, খারাপ, পচা-বাসি পণ্য বাজারে ভালো বলে বিক্রি করা, উপরে ভালো পণ্য সাজিয়ে ভিতরে পচা পণ্য রাখা, সংকট পূর্ণ সময়ে পণ্য গুদামজাত করে পরে বেশি দামে বিক্রি করা ইত্যাদি বিষয় নিজেদের সংশ্লিষ্ট করার সময় আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ আপনাকে সর্বদা দেখছেন। আপনি বাহ্যিকভাবে মানুষকে ঠকাচ্ছেন আর নিজে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হচ্ছেন।

আবার অফিস-আদালতে কোনো একটা কাজের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণ করা জেনো নিত্যনৈমিত্তিক বেপার। আপনি চাইলেই নিজেও নিয়ে পারেন আপনার কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে এসব থেকে দূরে সরে আসুন। বিনিমানে উত্তম প্রতিদান পাবেন। তাই আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখুন আপনার ইনকাম হালাল হচ্ছে নাকি? আপনি তাকওয়ার সাথে আপনার কর্মক্ষেত্রে কাজ করছেন কিনা? কোনো ভাবে হারামের সাথে নিজেকে জরিয়ে ফেলছেন কিনা ভেবে দেখুন আর নিজেই নিজেকে সাবধান করুন।

অধ্যায়- ১২ : আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিবিষ্ট থাকার জন্য দুটিরই প্রয়োজন: ভয় ও ভালোবাসা। শুধু ভয় নয়, আবার কেবল ভালোবাসা নয়, বরং উভয়ই প্রয়োজন, উভয়ই উপকারি।

কারো বিশেষ অবস্থা থাকতে পারে, বয়সভেদে ও বিশেষ অবস্থার কারণে ভয় অথবা ভালোবাসার প্রাবল্য হয়েও থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে নেক বান্দাগণের উভয় গুণই অর্জিত থাকে, তারা আল্লাহকে ভয়ও করে, ভালোও বাসেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুসম্পর্ক অটুট রাখতে দুটিরই খুব প্রয়োজন।

পার্থিব জীবনেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাবাকে সন্তান ভয় পায়, আবার একই সঙ্গে অনেক ভালোবাসে। কখনো কখনো ভালোবাসার কারণেই ভয় থাকে যে, কোনো কথা বাবাকে যেকোনোভাবে বলে ফেললে হয়ত বাবা খুব রাগ করবেন। তখন মনে এ কথার উদয় হয়, বাবা রাগ করলে আমার অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। এই যে টান ও ভালোবাসা,

এরই সঙ্গে অজানা এক ভয় ও ভীতি • বাবার সঙ্গে সুসম্পর্কের দরুন যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আল্লাহ তাআলার প্রতি যে ভয় ও ভালোবাসা সেটি অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। আল্লাহ পাকের সঙ্গে তো কোনো সৃষ্টির তুলনা চলে না। তাঁর সত্ত্বা অতি পবিত্র। তিনি সব জানেন, সব শোনেন। তিনি অমুখাপেক্ষী। সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। আমাদের যত দুর্বলতা, আদি ও অন্ত সম্পর্কে উনার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানুষের ভয়ের মতন উনাকে ভয় করা যায় না, আবার মানুষের মধ্যে পরস্পর যে ভালোবাসার সম্পর্ক, এটি ভিন্ন। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির ভয় ও ভালোবাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যুগে যুগে নেককার বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার পথে সাধনা করে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়েছে। তাই ঘুরে- ফিরে এ কথা বলতেই হয়, যা কিনা অনস্বীকার্য, আল্লাহওয়ালাদের মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া যায়। এটি আল্লাহ তাআলার সুন্নত (নিয়ম)। আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য যত ভালো গুণ প্রয়োজন সবই তাদের কাছ থেকে জানতে ও শিখতে হয়। আল্লাহ তাআলার ভয় ও ভালোবাসা গুণ অর্জনও এর ব্যতিক্রম নয়।

মৌলিকভাবে ভয় অতি উপকারী ও বুনিয়াদি বিষয়। তাই কুরআন মাজীদে বার বার ভয় করতে বলা হয়েছে। কারণ এই ভয় আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের সহজ ও কার্যকরী মাধ্যম। যে যত বড় হয় তাঁর বড়ত্ব উপলব্ধি করা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। ভয়ের স্তর পার হয়ে বড়র কাছে পৌঁছতে পারলে তাঁর মর্যাদা ও শান-শওকত সঠিকভাবে বুঝে আসে। তাঁর বড়ত্ব অন্তরে স্থায়ী হয়। তারপর যে ভাব সেই সত্ত্বার সঙ্গে জন্মে সেটি খাঁটি হয়, কারণ তার ভিত্তি অনেক মজবুত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সুসম্পর্ক খাঁটি ভালোবাসা উৎপন্ন করে। তখন সম্পর্কে ভারসাম্য থাকে। কারণ, সম্মানের পাত্র যিনি, তাঁর পরিচিতি, মর্যাদা ও মাকাম সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে।

আসলে আল্লাহ তাআলার শান, তাঁর মর্যাদা, তাঁর তুলনা সম্পর্কে আমরা কী বলব আর কী বোঝাব?! তাঁর হাবীব, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নবীজী আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার প্রশংসায় বলেন:

لا أحصى ثناء عليك
أنت كما أثبتت على نفسك

অর্থ: আমি তোমার (পরিপূর্ণ) প্রশংসা করতে সক্ষম নই, তোমার প্রশংসা তেমনই যেমনটি তুমি স্বয়ং তা করেছ! (ইবনে মাজাহ)

সেই সুমহান সত্ত্বার ভয় ও ভালোবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে হাজার-কোটি জীবন ফেদা (বিসর্জন) হলেও তা তুচ্ছ! (কিন্তু নিঃসন্দেহে এ পথে সামান্য প্রচেষ্টা বড় মহৎ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম)

আমরা কদম উঠালে তিনি আমাদেরকে তাঁর পথে উঠিয়ে পথ পার করে তাঁর (সন্তুষ্টি) পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন ইনশাআল্লাহ। সুদৃঢ় ইচ্ছা, সাধ্যমতন চেষ্টা আর দোআকে পুঁজি করে তাঁর দিকে ধাবিত হতে হবে আমাদের।

অতএব, আপনি যাই করুন না কেনো তা যদি হয় আল্লাহকে ভালোবেসে তবে তা কতই না উত্তম হবে। আল্লাহ তো সুমহান, অতীব দয়ালু। আল্লাহকে ভয় পেয়ে কোনো কাজ করার চেয়ে একবার আল্লাহকে ভালোবেসে সেই কাজটা করেই দেখুন একবার। এর মাঝে অনেক শান্তি বিরানমান।

আপনি নামাজে দাঁড়ান আল্লাহর ভয়ে বা আল্লাহর শান্তির ভয়ে কিন্তু একটি বার আল্লাহকে ভালোবেসে নামাজে দাঁড়িয়ে দেখুন কতো প্রশান্তি কাজ করে।

আপনি আল্লাহর ভয়ে কাদেন, কিন্তু আল্লাহকে ভালোবেসে কাদুন দেখবেন আপনার জন্য সবর করা সহজ হবে।

একটা বেপার খেয়াল করলে দেখা যায়, আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা কুরআনের প্রথম দিকের সুরা গুলাতে মানুষকে শুধু বুঝিয়েই গেছেন। আদর ভালোবাসা দিয়ে, নেয়ামত দিয়ে, মুজিজা দেখিয়ে, সুসংবাদ দিয়ে, পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু পরের সুরা গুলাতে

আল্লাহ শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন। ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলেছেন, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, কবর এগুলো নিয়ে বলেছেন। আল্লাহ তখন আর বুঝান নাই, বরং কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

আল্লাহ বান্দাদের ভালোবাসেন। তিনি চান না আমরা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাই। তাই তিনি আগে বুঝিয়েছেন, বার বার সাবধান করেছেন। তারপর যেয়ে তিনি শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন।

তাই আমাদেরও উচিত আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি উনাকে ভালোবাসা। ভালোবেসে সব কিছু করা। পৃথিবীর কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতে হবে। আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি তখন তার মতো করে চলতে ফিরতে পছন্দ করি। আর যাকে ভয় করি তার থেকে দূরে দূরে থাকতে চাই বা তার শাস্তির ভয়ে কোনো রকম তার কথাটা শুনি। কিন্তু আল্লাহ আমাদের রব, আমাদের মালিক। তাই উনাকে ভালোবেসেই আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর উনারে ভালো না বাসলে আর কাকে ভালোবাসব? পৃথিবীর সবার থেকে সব কিছু থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহ ও উনার রাসুল (সা:) কে, তবেই আমরা প্রকৃত মুমিন হইতে পারব।

অধ্যায়- ১৩ : পরিশেষ

তাকওয়া আসলে যেনোতেনো বিষয় না। আপনি চাইলেই মানলেন আর না চাইলেই মানলেন না বেপারটা না এমন না। তাকওয়া এমন একটা জিনিস যা নিজের মাঝে থাকলে জীবন সুন্দর, আর তাকওয়া না থাকলে জীবন এলোমেলো। মুমিন মুত্তাকী হইতে গেলে অনেক বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট আসবে। কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণের পথ আল্লাহ নিজে বের করে দিবেন। আল্লাহ নিজে সাহায্য করবেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যদি হয় আল্লাহর জন্য তবে আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্য উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করে রাখবেন। তাকওয়ার মাধ্যমে সকল পাপ থেকে বিরত থাকা যাবে। আর বিরত থাকার মানে হচ্ছে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ত্যাগ করা। এইটা খাস দিলে করতে হবে। নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকতে হবে। আর তাকওয়ার দ্বারা দেহ ও মন প্রশান্তি

লাভ করবে। তাকওয়া অবলম্বন করে অতীত কর্মের জন্য তাওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য পাপ থেকে বিরত থাকা ও গুনাহ না করে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে সংশোধিত হওয়া।

পরিশেষে বলতে চাই, তাকওয়া অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্টি হতে হবে। কেননা তাকওয়া ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব না। তাছাড়া পার্থিব জীবনে মানুষ যা অর্জন করে, তার মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে সর্বোত্তম। কারণ, এটাই কল্যাণ ও সফলতা লাভের উপায় এবং ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম।

কবি আবুদুদারদা বলেন,

“মানুষ আশা করে যে, তার আকাজ্খা পূর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। মানুষ বলে আমার উপকার, আমার সম্পদ। অথচ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে উপকৃত হওয়ার সর্বোত্তম বিষয়।”

অতএব, আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইহকাল ও পরকালের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় তাকওয়া অর্জন করার তৌফিক দান করুন-আমিন।

যা কিছু ভালো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু খারাপ সব সয়তানের পক্ষ থেকে। ভুল ত্রুটি হইলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ